পালযুগের চিত্রকলা

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

KURKIHAR, GAYA AND BODHGAYA
EARLY SCULPTURE OF BENGAL
BUDDHIST SHRINES IN INDIA
GLIMPSES OF MUGHAL ARCHITECTURE
A CENTURY OF HISTORIC PRINTS
A SURVEY OF INDIAN SCULPTURE
INDIAN TEXTILES
EIGHTEENTH CENTURY NORTH INDIAN PAINTING
EAST INDIAN MANUSCRIPT PAINTING
INDIAN ART AT THE CROSS-ROADS
ARCHITECTURE OF BENGAL (I)
TANTRAYANA ART—AN ALBUM
INDIAN ARCHITECTURE
(IN PRESS)

পালযুগের চিত্রকলা

সরসীকুমার সরস্বতী



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন   কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা বিপুল গুহ প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ কপিরাইট সরসীকুমার সরস্বতী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট
লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৪০·০০

স্বর্গতা পত্নীর উদ্দেশে

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

বিষয়-সূচী

পূর্বাভাষ

১৯৩১ সালে, আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভে, পাল যুগের চিত্রকলার কিছু নিদর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নেহাত আকস্মিকভাবে। এই সময় বর্তমান বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত সংগ্রহাগারে ছেঁড়া কাগজপত্রের জঞ্জালের মধ্যে এই চিত্রকলার কয়েকখানি নিদর্শন আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য আমার হয়। সংগ্রহাগারের তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এসব নিদর্শনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। হয়তো কোন উৎসাহী সদস্যের আনুকূল্যে এগুলো এককালে সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নজর এড়িয়ে এগুলো স্থান পায় জঞ্জালের স্তূপে। আমারই প্রচেষ্টায় এসব নিদর্শন সংগ্রহাগারের নথীভুক্ত করা হয়। এই কয়েকখানি নিদর্শনের মধ্যে একখানিতে তারিখ দেখা যায়—সে তারিখ প্রায় নয়শত বৎসর পূর্বের (ক তালিকার ১৬ নং)। প্রায় একযুগ পরে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে এসে এই চিত্রকলার আরও কয়েকখানি নিদর্শনের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রায় সমসময়ে ব্যক্তিগত মালিকানার তিনখানি নিদর্শনও আমার নজরে আসে। একখানি বাদে অন্য দুখানির বর্তমান অবস্থান এখন জানা নেই। এ দুখানা হয়তো বিদেশে চলে গেছে কোন ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে।

পাল যুগের চিত্রকলার কিছু কিছু নিদর্শনের সান্নিধ্যে এসে এই চিত্রকলার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। অনুসন্ধানের শুরুতে দেখা যায় এ সম্বন্ধে কাজ হয়েছে অতি সামান্য। আমাদের দেশে যে ক'খানি মূল নিদর্শন আছে তার সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশই এখন আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগ্রহাগারে আর গ্রন্থশালায়। য়ুরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে এসব নিদর্শন। মূল নিদর্শনগুলো পরীক্ষার সুযোগের অভাবে বহুদিন একাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিদেশে রক্ষিত নিদর্শনগুলো দেখবার সুযোগ মিলে গেল নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব ইন্টার-ন্যাশনাল এডুকেশনের সৌজন্যে। ১৯৬৭ সালে ইনস্টিটিউট আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য। এই অবসরে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রহাগারে রক্ষিত পাল চিত্রকলার মূল নিদর্শনগুলো পরীক্ষা করতে সক্ষম হলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিছু অজানা নিদর্শনেরও সন্ধান পাওয়া গেল। দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল এইভাবে।

১৯৬৯ সালে নূতন দিল্লীর ললিতকলা আকাদমী আমাকে আহ্বান জানালেন কুমারস্বামী স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য। এই সুযোগে দুটি বক্তৃতায় আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি পাল চিত্রকলার, তখন পর্যন্ত জানা তারিখ-যুক্ত নিদর্শনের পরিচয় সহ। এই বক্তৃতা দুটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ১৯৭৪ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাল চিত্রকলা সম্পর্কে

আমি তিনটি বক্তৃতা দিই বাংলায়। বর্তমান পুস্তক সেই বাংলা বক্তৃতার পরিবর্ধন। ললিতকলা আকাদমী কর্তৃক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশে অযথা বিলম্ব হওয়ায় স্বজন আর বন্ধুবর্গের অনুরোধে পাল চিত্রকলার বাংলা সংস্করণ আমি উপস্থিত করছি সুধীসমাজে। বলা বাহুল্য, এতে অনেক নতুন তথ্যের সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। ললিতকলা আকাদমীর বক্তৃতায় তারিখ-যুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পাল চিত্রকলার নিদর্শনের তালিকায় তার সংখ্যা ছিল মাত্র বিশখানি। পরে আরও নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে, ফলে এখন তার সংখ্যা হচ্ছে আটাশ। তার মধ্যে দু'খানার সন্ধান আমরা পেয়েছি অতি সম্প্রতি, এই পুস্তক প্রেসে যাবার পর।

পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। বাংলায় এই ধরনের ছবিসহ বই প্রকাশের সীমিত ব্যবস্থার দরুণ পাণ্ডুলিপি পড়েছিল অনেকদিন। গত বৎসরের মাঝামাঝি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমল মিত্র 'দেশ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ মহাশয়কে বইখানির কথা জানান। শ্রীযুক্ত ঘোষ আগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে এটি 'দেশ'-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, আর আনন্দ পাবলিশারস্ কর্তৃক এটি পুস্তকাকারে প্রকাশেরও প্রস্তাব দেন। আনন্দ পাবলিশারস্-এর শ্রীযুক্ত বাদল বসু মহাশয়ও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এ'দের সবার কাছে আমি আন্তরিক ভাবে ঋণী।

আমার কন্যা ডঃ শ্রীমতী রঞ্জনা মুখোপাধ্যায় পুস্তকের পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি তৈরী করে শুধু আমার শ্রমই লাঘব করেননি, সুষ্ঠু মুদ্রণেও সহায়তা করেছেন বিশেষভাবে। পণ্ডিতপ্রবর বন্ধু বরোদার ডঃ উমাকান্ত শাহ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানি নিদর্শনের রঙীন প্রতি-লিপি দিয়েছেন আমার ব্যবহারের জন্য, আর তারিখ-যুক্ত একখানি অজানা নিদর্শনের সন্ধান ও পরীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন। স্নেহাস্পদ ছাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দীপক ভট্টাচার্য লণ্ডনের একখানি অজানা নিদর্শনের সন্ধান দিয়েছেন, আর তার রঙীন প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ সুহৃদ্বর রবার্ট স্কেল্টন মহোদয় অযাচিত ভাবে। বরোদা সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ডঃ সমীর ভৌমিক আমাদের ক তালিকার ১৫ নং নিদর্শনের রঙীন ও সাদাকালো প্রতিলিপি দিয়েছেন। সবাইকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিভিন্ন সংস্থা তাঁদের নিদর্শন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এই পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করেছেন। চিত্র-পরিচিতিতে তাঁদের সৌজন্য স্বীকার করা হয়েছে।

কল্যাণী নারী আপন সেবা আর সাহচর্যে মানুষকে এগিয়ে দেন সার্থকতার পথে; তিনি থাকেন অন্তরালে সাঁঝের দীপশিখার মত পথ দেখাবার জন্য। এ আমার নিজের জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। সে দীপশিখা নিবে গেছে সম্প্রতি। বইখানি নিবেদন করা হল হারিয়ে যাওয়া সেই শিখাকে স্মরণ করে।

শুক্লা ত্রয়োদশী, ৩ আষাঢ়, ১৩৮৫। সরসীকুমার সরস্বতী

চিত্র-পরিচিতি

১। পুঁথির দুখানি চিত্রিত পত্র—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

এই পুঁথিতে পাঁচখানি চিত্রিত পত্র আছে। প্রতি পাতায় তিনখানি করে চিত্র, তাছাড়া ছিদ্রস্থানে আছে জ্যামিতিক অলঙ্করণ। প্রতি পাতায় লেখা আছে পাঁচ পংক্তি। লেখার ধরন পূর্ব-ভারতীয়, যদিও খানিকটা নেওয়ারী ধাঁচে।

পৃঃ ২৬ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

২। পুঁথির চিত্রিত পাতা—লক্ষ্মণসেন-গতসম্বৎ ৪ (দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

এই পুঁথির পাতায়, তখনকার নিয়মানুযায়ী, পাঁচখানি চিত্রফলক দেখা যায়—কেন্দ্রস্থানে একখানি, দুই প্রান্তে দুখানি, আর পাতার দুটি ছিদ্রস্থানে উপর-নীচে বিভক্ত দুখানি। প্রতি পাতায় আছে পাঁচ পংক্তি লেখা। পাতার ছবিগুলো অস্পষ্ট হওয়ায় পুরো পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এ পুঁথির পাতায় লেখার বিপরীতে ছবি দেখা যায়। এ ধরনের চিত্রাঙ্কনের ব্যাখ্যার জন্য পৃঃ ১৬০, ১৬২ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ২৯ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

৩। পুঁথির দুখানি চিত্রিত পাটা—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

পুরো পাটার মধ্যাংশ মাত্র। উপরের পাটায় আছে প্রজ্ঞাপারমিতা (কেন্দ্রস্থানে), বসুধারা (ডাইনে) আর মহাশ্রী তারা (বাঁয়ে); নীচের পাটায় আছে ধর্মচক্র-প্রবর্তন-রত বুদ্ধ (কেন্দ্রস্থানে), অবলোকিতেশ্বর (ডাইনে) আর মৈত্রেয় (বাঁয়ে)। এই পুঁথির পাতার চিত্রে মধ্যযুগীয় আদর্শের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু পাটার চিত্র অনেক উন্নত মানের, হয়তো বর্তনা-সচেতন কোন শিল্পীর কৃতি।

পৃঃ ৩২ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৪। ভগবান বুদ্ধের জন্ম—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্ক (দশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

ত্রিভঙ্গ-সংস্থানে মায়াদেবী বাঁদিকে ভগিনীর কাঁধে ভর দিয়ে শাল গাছের ডাল ধরে আছেন ডান হাতে। গায়ের বর্ণ সুবর্ণ-গৌর, মাথা ঘিরে প্রভা, পরনে ফুলওয়ারী শাড়ী ও কঞ্চুক। শিশু বুদ্ধ মায়াদেবীর ডান পাশ থেকে বেরিয়ে আসছেন, তাঁকে গ্রহণ করছেন ইন্দ্র। ইন্দ্র আর মায়াদেবীর মাঝখানে শিশু বুদ্ধকে দাঁড়ানো অবস্থায় আবার দেখা যাচ্ছে—হচ্ছে তাঁর অভিষেক। লাল রঙের পশ্চাৎপটে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে একটি কলা গাছ। ছবিখানি অনেক অস্পষ্ট হয়ে গেলেও চিত্রাঙ্কনের গুণ-বৈশিষ্ট্য

বুঝতে কষ্ট হয় না। (পৃঃ ১৩৮-১৩৯)। চিত্র নং ২০ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৫ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৫। নালগিরি-বশীকরণ—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাংক (দশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

দুজন সংগী সহ বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন বাঁদিকে মুখ করে। সামনে মাতাল হাতী নালগিরিকে দেখানো হয়েছে দুবার—একবার শুঁড় উঁচিয়ে তাড়া করা অবস্থায়, আর দ্বিতীয়বার মাটিতে লুটিয়ে পড়া ভংগীতে। বুদ্ধদেব বাঁ হাতে কাপড়ের প্রান্ত ধরে আছেন, ডান হাতে শান্ত করছেন মাতাল হাতীকে। অংকন হয়েছে লাল রঙের প্রভার মত পশ্চাৎপটে—তার দুদিকে দেখা যাচ্ছে দুটি কলা গাছ। ছবিটি মুছে গেছে অনেকখানি। চিত্র নং ১১, ৫০ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৮ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৬। মহাসাহস্রপ্রমর্দনী—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাংক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

মহাসাহস্রপ্রমর্দনী রক্ষা-মণ্ডলের পঞ্চ মহাদেবীর অন্যতমা। এ ছবিতে দেবী দাঁড়িয়ে আছেন প্রত্যালীঢ়-পদে, পেছনে লাল অগ্নিশিখার পশ্চাৎপট। গায়ের বর্ণ ধুসর। ছয় হাত: (ডাইনে) খড়্গ, বাণ, বরদ; (বাঁয়ে) ধনুক, পাশ, অস্পষ্ট। ভ্রূকুটি-করাল চোখ, ত্রিনেত্র। ঊর্ধ্বকেশী, শিরে কপালমালা। ফুল-ওয়ারী সাদা কঞ্চুক আর নীল শাড়ী। (সাধনমালা, ১৯৮ নং)। চিত্র নং ২২ দ্রষ্টব্য।

S. K. Saraswati, *Tantrayāna Art: An Album*, pp. LXXXVII.

পৃঃ ৪১ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৭। মহাপ্রতিসরা—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাংক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

কনক-বর্ণোজ্জ্বলা দেবী বজ্রপর্যংকে পদ্মের উপর আসীনা, ঊর্ধ্বাংশে সহজ ভংগিমা। তিন মাথা ঘিরে শ্বেত বর্ণের প্রভা। আট হাত: (ডাইনে) উদ্যত খড়্গ, বজ্র (?), পরশু, বরদমুদ্রা; (বাঁয়ে) চক্র (?), পুষ্প অথবা রত্নচ্ছটা, অস্পষ্ট, পাশ। সবুজ রঙের শাড়ী ও কঞ্চুক। লাল রঙের পশ্চাৎপট। মহাপ্রতিসরা রক্ষা-মণ্ডলীর অন্যতমা দেবী, কোন মতে প্রধানতমা দেবী। এই রূপাংকন দেবীর কোন বর্ণনার সংগে মেলে না। চিত্র নং ১৭ দ্রষ্টব্য।

S. K. Saraswati, *Op.-cit.*, pp. LXXXVI-LXXXVII.

পৃঃ ৪৪ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৮। দেবী—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাংক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

দেবী বজ্রপর্যংকে উপবিষ্টা, ঊর্ধ্বাংশে সহজ ভংগিমা। গায়ের রঙ ধুসর। ডান হাত বুকের কাছে

লগ্ন, বাঁ হাত কোলের উপর ন্যস্ত। ডান হাতের মাঝ দিয়ে উঠেছে একটি সনাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। দেবীর ত্রিনেত্র, মাথা ঘিরে আছে সাদা প্রভা। পুষ্প-খচিত কেশদাম, ফুলওয়ারী কঞ্চুক আর ডুরে শাড়ী। নীল রঙের পশ্চাৎপট। তারা দেবীর রূপ-বিশেষ দেখানো হয়ে থাকতে পারে এই চিত্রে।

পৃঃ ৪৭ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৯। নৈরাত্মা-যোগিনী—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

ধূসর-বর্ণা দেবী প্রত্যালীঢ়-পদে দাঁড়িয়ে আছেন অগ্নিশিখা-মণ্ডলের মধ্যে। খর্বকায়া লম্বোদরী দেবীর মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-ভীষণ, পিঙ্গল কেশ ঊর্ধ্বমুখী, শিরোদেশ কপালমালা-মণ্ডিত। দেবী দংষ্ট্রা-করালবদনা ও ত্রিনেত্রা। পরনে বাঘছাল। ডান হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, আয়ুধ অস্পষ্ট, বাঁ হাতে দেখা যায় হৃদিলগ্ন তর্জনী মুদ্রা।

এই ধরনের দেবীর দশখানি চিত্র এই পুঁথিতে দেখা যায়—ডান হাতে শুধু আয়ুধের ইতরবিশেষ। নৈরাত্মা দেবীর দশটি যোগিনীর উল্লেখ আছে বৌদ্ধ প্রতিমাশাস্ত্রে। এই দশটি দেবীকে নৈরাত্মার যোগিনী বলে পরিচয় দেওয়া যায়।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. XCII-XCIII.

পৃঃ ৫০ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১০। মৈত্রেয়-বুদ্ধ—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের চল্লিশের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

বুদ্ধ অঞ্জলি-হস্তে বাঁ দিকে মুখ করে বসে আছেন—পরনে লাল রঙের সংঘাতি। মাথা ঘিরে প্রভা, চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু উষ্ণীষ নাই। বাঁ দিকে উপরের অংশে দেখা যায় এক পাহাড়, তাতে আছে এক কুক্কুট, একটি স্তূপ আর একটি প্রজ্বলিত চিতা। বাঁ দিকে নীচে পুষ্পাস্তীর্ণ এক বৃত্তক্ষেত্র। এই চিত্র-বিন্যাস তুষিত স্বর্গ থেকে মৈত্রেয়-বুদ্ধের মর্ত্যে অবতরণের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। কুক্কুটের অবস্থিতিতে পাহাড়টি কুক্কুটপাদ গিরি বলে চিহ্নিত করা চলে। কাহিনী অনুসারে এই গিরির উপর একটি স্তূপে কাশ্যপ-বুদ্ধ অপেক্ষা করছিলেন মৈত্রেয়ের মর্ত্যে আগমনের। মৈত্রেয় পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হলে উপরের স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলেন কাশ্যপ, আর বুদ্ধের পোষাক তুলে দিলেন মৈত্রেয়ের হাতে। শুরু হল মর্ত্যে মৈত্রেয়-বুদ্ধের শাসন। কাশ্যপ-বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন—তাঁর মরদেহ চিতায় ভস্মীভূত হল। পুঁথিখানির শেষ পাতার এই চিত্রে দেখা যায় সেই অলৌকিক কাহিনীর রূপায়ন।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. XCI-XCII.

পৃঃ ৫৩ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১১। নালগিরি-বশীকরণ—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীচের পাতার ছবিতে বুদ্ধদেব দুজন সঙ্গীসহ দাঁড়িয়ে আছেন বাঁ দিকে মুখ করে। সামনে মাতাল

হাতী—একবার শঁুড় উঁচিয়ে তাড়া করা অবস্থায়, দ্বিতীয় বার মাটিতে লুটিয়ে পড়া ভঙ্গিতে। বুদ্ধ মত্ত হাতীকে শান্ত করছেন ডান হাতে আগুন বিকিরণ করে। হাতী তাড়া করায় সঙ্গী দুজন ভয়ে আঁকড়ে ধরেছে বুদ্ধকে। চিত্র নং ৫, ৫০ দ্রষ্টব্য।

উপরের পাতার ছবিতে দেখা যাচ্ছে চতুর্ভুজ এক দেব-মূর্তি। হাতের আয়ুধ স্পষ্ট নয়।

পৃঃ ৫৬ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১২। মহাপ্রাতিহার্য/মহাপরিনির্বাণ—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাংক। (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীচের পাতায় ধর্মচক্রপ্রবর্তন-রত বুদ্ধ, দু পাশে অনুরূপ দুজন বুদ্ধ। প্রত্যেকেরই মাথায় উষ্ণীষ সহ জটাভার, মাথা ঘিরে প্রভা, দেহাবরণে লাল সঙ্ঘাতি। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীর সভায় ব্যাখ্যান-রত অবস্থায় আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেছিলেন—ঘটনাটি মহাপ্রাতিহার্য নামে পরিচিত।

উপরের পাতায় দেখানো হয়েছে কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ। পালংকে বুদ্ধদেব শুয়ে আছেন ডান পাশে—তাঁকে ঘিরে শিষ্য ও অনুগামীরা।

পৃঃ ৫৯ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১৩। দেবাবতরণ—দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের সত্তরের দশক)। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীচের পাতায় বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন ডান দিকে মুখ করে—পরনে লাল রঙের সঙ্ঘাতি। মাথা ঘিরে প্রভা, শিরে উষ্ণীষ। ডান হাতে বরদ ও বাঁ হাতে জ্ঞান মুদ্রা। ডাইনে ব্রহ্মা, বাঁয়ে ইন্দ্র। কাহিনী মতে বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ধর্ম প্রচার করে মর্ত্যে অবতরণ করেন সংকাশ্য নগরে—এই অবতরণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ব্রহ্মা আর ইন্দ্র, প্রথমজন তাঁকে চামর দিয়ে ব্যজন করেন, আর ইন্দ্র তাঁর মাথায় ধরেন ছাতা। এই কাহিনীটি ভাস্কর্যে আর চিত্রে রূপ পেয়েছে বারবার। এখানে আমরা পাচ্ছি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ সুপরিচিত বিন্যাস-ভঙ্গিতে। চিত্র নং ২৭, ৪৯ দ্রষ্টব্য।

উপরের পাতার চিত্রটি অস্পষ্ট—কোন দেব বা দেবীর মূর্তি।

পৃঃ ৬২ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

১৪। মৃত্যুবঞ্চন তারা—রামপালদেবের নবম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

বজ্রপর্যঙ্কে আসীনা দেবীর ঊর্ধ্বাংশে সহজ ভঙ্গিমা। গায়ের রঙ ধূসর-সিত। ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে সনাল নীলোৎপল। চাঁচর কেশদামে রত্নময় বেষ্টনী। পরনে ফুলওয়ারী সাদা শাড়ী। রেখা-বর্তনা আর বর্ণ-বর্তনার সৌকর্য লক্ষণীয়। সাধনমালা, নং ১০২, ১০৩, ১১২ দ্রষ্টব্য।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, p. XXXV.

পৃঃ ৬৫ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

১৫। মহামায়ূরী—রামপালদেবের নবম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামায়ূরী পঞ্চরক্ষা-মণ্ডলীর অন্যতমা দেবী। পীত-বর্ণা দেবী পদ্মের উপর আসীনা, ডান পা আসনের সমান্তরালে, বাঁ পা তুলে। ডান হাতে অভয় মুদ্রা, বাঁ হাতে ময়ূরপুচ্ছ। (সাধনমালা, নং ২০১—এ চিত্রে বরদ মুদ্রার পরিবর্তে অভয় মুদ্রা দেখানো হয়েছে)।

বর্তনা-বোধের অপরূপ প্রকাশ দেখা যায় এই চিত্রে আর এ পুঁথির অন্যান্য চিত্রে।

পৃঃ ৬৮ — ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

১৬। রক্ষা মহাদেবী—রামপালদেবের নবম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

দেবী বসে আছেন বাঁ দিকে মুখ করে। লালিত্যে আর দেহ-সুষমায় এই চিত্র আগের দুটি দেবীর চিত্রের অনুরূপ। চিত্রটি অস্পষ্ট হওয়ায় কোন দেবীর রূপ এটি তা নির্ধারণ করা যায় না।

পৃঃ ৭১ — ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

১৭। রক্ষা মহাদেবী—রামপালদেবের নবম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ পাদ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

বজ্রপর্যঙ্কে নিষন্না দেবীর ঊর্ধ্বাংশে সহজ ভঙ্গিমা। দেবীর তিন মুখ আর আট হাত—মূল মুখে ত্রিনেত্র। অস্পষ্টতার দরুন আয়ুধ কোন ক্ষেত্রেই সঠিক চেনা যায় না, ফলে এটি কোন দেবীর রূপ তাও বলা দুরূহ। তবে এটি যে রক্ষা-মণ্ডলীর কোন্ মহাদেবীর রূপ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রূপটি মহাপ্রতিসরার হবার সম্ভাবনা আছে (সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী ও ধর্মকোষ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য)। S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. LXXVI-LXXVII.

পৃঃ ৭৪ — ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

১৮। প্রজ্ঞাপারমিতা-উদ্ধার—হরিবর্মদেবের অষ্টম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের শুরু)। বরোদা সংগ্রহশালা।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাগলোক থেকে প্রজ্ঞাপারমিতা-শাস্ত্রের উদ্ধার দেখানো হয়েছে এই চিত্রে। কথিত আছে এই শাস্ত্র বুদ্ধদেব স্বয়ং নাগদের হেপাজতে রেখেছিলেন, পরে আচার্য নাগার্জুন নাগলোক থেকে তার উদ্ধার সাধন করেন। মহাসমুদ্রে বন্দনা-রত নাগদ্বয়ের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে এক মহাস্তূপ, উপরে অন্তরীক্ষে পাঁচটি ছত্র। এই স্তূপ শাস্ত্রের আধার-মঞ্জুষা হতে পারে, বা তার প্রতীকও হতে পারে।

পৃঃ ৭৭ — বরোদা সংগ্রহশালার সৌজন্যে

১৯। মহাশ্রী তারা—হরিবর্মদেবের অষ্টম রাজ্যাংক (একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের শুরু)। বরোদা সংগ্রহশালা।

শ্বেত-বরণা দেবী সুখাসনে পালঙ্কে বসে আছেন। দুহাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। রত্নাভরণ, কেশপাশ রত্নললাটিকায় বন্ধ। সামনে দুজন সহচরী দেবী (সাধনমালা, নং ১১৬)। চিত্র নং ৩, ২১, ৪৪, ৫৩ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮০ বরোদা সংগ্রহশালার সৌজন্যে

২০। ভগবান বুদ্ধের জন্ম—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক (খ্রীঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

ত্রিভঙ্গ-সংস্থানে মায়াদেবী ভগিনীর কাঁধে ভর দিয়ে ডান হাতে শালগাছের ডাল ধরে আছেন। বুদ্ধদেব বেরিয়ে আসছেন তাঁর ডান পাশ থেকে। তাঁকে গ্রহণ করছেন ইন্দ্র। অভিষেক-দৃশ্য এ চিত্রে না থাকায় রচনা অনেক সরল হয়েছে। আনুষঙ্গিক দৃশ্যে মধ্যযুগীয় মানসের ছাপ দেখা যায় খণ্ডিত রেখা-বিন্যাসে আর উদ্গত নেত্রে। আবার মায়াদেবীর চিত্রে আছে মার্গরীতির অনুসরণে রেখা ও বর্ণ-বর্তনার বিশেষ অভিব্যক্তি। চিত্র নং ৪ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮৩ লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২১। মহাশ্রী তারা—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক (খ্রীঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক গ্রন্থাগার।

হরিত-বরণা দেবী পালঙ্কে সুখাসনে বসে আছেন। দুহাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। একজন সহচরী দেবীর পদসেবায় নিরতা। সামনে আবার দুজন সহচরী দেবী। ছবিখানি বর্তনার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। (সাধনমালা, নং ১১৬)। চিত্র নং ৩, ১৯, ৪৪ ও ৫৩ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮৬ লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২২। মহাসাহস্রপ্রমর্দনী—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক (খ্রীঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

খর্বকায়া লম্বোদরী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন প্রত্যালীঢ়-পদে। ছয় হাত : ডাইনে, খড়্গ, বাণ, শূল অথবা অঙ্কুশ; বাঁয়ে, ধনুক, পাশ, তৃতীয় হাত হৃদিলগ্ন, কিন্তু আয়ুধ অস্পষ্ট। দেবীর রূপায়নে রেখা-বর্তনা ও বর্ণ-বর্তনা লক্ষণীয়। চিত্র নং ৬ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮৯ লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২৩। বজ্রসত্ত্ব—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক (খ্রীঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

বজ্রপর্যঙ্কে উপবিষ্ট দেবতার হৃদিলগ্ন ডান হাতে বজ্র আর কোলের উপর ন্যস্ত বাঁ হাতে ঘণ্টা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর। পরনে ডুরে ধুতি; রত্নাভরণে ভূষিত দেহ। রঙ কিছুটা অস্পষ্ট হলেও চিত্রের রেখা-সৌষ্ঠব লক্ষণীয়।

পৃঃ ৯২ লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২৪। কুরুকুল্লা—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্ক (খৃীঃ ১১৭০-৭১)। লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

দেবী বজ্রপর্যঙ্কে আসীনা—ঊর্ধ্বাংশে সহজ ভঙ্গিমা। রঙ ঈষৎ রক্ত। চার হাত: মূল দুই হাতে দেবী ধনুকে শর সংযোজন করছেন; অপর ডান হাত কোলের উপর ন্যস্ত, অন্য বাঁ হাতে সনাল কমল। রেখা-সৌষ্ঠব ও বর্ণ-বর্তনায় এই চিত্র মার্গরীতির চিত্রের প্রসাদ-গুণ স্বতঃই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেবী কুরুকুল্লার রূপ পূর্ব-ভারতীয় শিল্পে খুবই বিরল। এই দেবীর চতুর্ভুজা রূপ বর্ণিত হয়েছে সাধনমালার ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪ ও ১৮৮ নং সাধনে। এই রূপের একটি ধাতুমূর্তি পাওয়া গেছে বিহার থেকে, পূর্ব-ভারতের দ্বিতীয় নিদর্শন দেখা যাচ্ছে এই চিত্রাঙ্কনে।

পৃঃ ৯৫ লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২৫। তান্ত্রিক দেবতা—গোবিন্দপালদেবের অষ্টাদশ সম্বৎসর (খৃীঃ ১১৭৯-৮০)। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

লাল অগ্নিশিখার পশ্চাৎপটে প্রত্যালীঢ়-পদে দাঁড়িয়ে আছেন নীল রঙের ভীষণাকৃতি এক দেবতা। পরনে বাঘছাল, লাল বর্তুল নেত্র, দংষ্ট্রাকরাল বদন। দু হাত বুকের কাছে যুক্ত, ভঙ্গি দেখে মনে হয় বজ্রহুংকার মুদ্রা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধ প্রতিমা-মণ্ডলীতে অনেক তান্ত্রিক দেবতার জন্য নির্দিষ্ট আছে বজ্রহুংকার মুদ্রা—আর কোন লক্ষণ স্পষ্ট না থাকায় এই দেবতার সঠিক রূপ নির্ণয় করা যায় না।

পৃঃ ৯৮ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২৬। তান্ত্রিক দেবী—গোবিন্দপালদেবের অষ্টাদশ সম্বৎসর (খৃীঃ ১১৭৯-৮০)। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

পীত-বরণা দেবী বসে আছেন মন্দিরে। দেবীর পেছনে দেখা যায় লাল রঙের পশ্চাৎপট। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ ত্রিপত্রাকৃতি খিলানে শোভিত। দেবীর অনেক হাত—মনে হয় আট। তবে অস্পষ্টতার দরুন হাতের সংখ্যা বা তাদের আয়ুধ নির্ণয় করা যায় না।

পৃঃ ১০১ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

২৭। দেবাবতরণ—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

লাল রঙের সংঘাতি পরনে বুদ্ধদেব বাঁ দিকে মুখ করে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছেন। শিরে কোণাকৃতি উষ্ণীষ। ডান হাত বরদ মুদ্রায় আর বাঁ হাত ঘাড়ের কাছে ধরা। বুদ্ধদেবের ডাইনে ইন্দ্র ছাতা ধরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, আর বাঁয়ে ব্রহ্মা চামর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। চিত্র নং ১৩, ৪৯ দ্রষ্টব্য। উপরন্তু দেখা যায় নীল রঙের চতুর্ভুজা এক দেবী মূর্তি। এ কাহিনীর চিত্রণে এটি নূতন সংযোজন।

পৃঃ ১০৪ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

২৮। মৈত্রেয়—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

বৌদ্ধ প্রতিমা-শাস্ত্রে মৈত্রেয়ের দুটি রূপ—এক বোধিসত্ত্ব, আর দুই ভবিষ্য বুদ্ধ। বুদ্ধ রূপে মর্ত্যে আগমনের অপেক্ষায় তিনি আছেন তুসিত স্বর্গে বোধিসত্ত্ব রূপে। স্বর্গ থেকে সময় হলে তিনি নেমে আসবেন মর্ত্যে বুদ্ধ রূপে। এ কাহিনীর রূপাঙ্কন আমরা পেয়েছি আমাদের ১০ নং চিত্রে। প্রসিদ্ধি আছে তুসিত স্বর্গে মৈত্রেয়ের নিকট অসঙ্গ তন্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এ কারণে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের আসন বেশ উঁচুতে। তাঁর রূপ ভাস্কর্যে ও চিত্রে দেখা যায় অনেক। এই চিত্রে মৈত্রেয় অর্ধপর্যঙ্কে আসীন—ডান হাতে অক্ষসূত্র, বাঁ হাতে নাগকেশর ফুল। মাথায় জটামুকুট, মুকুটের সম্মুখ ভাগে স্তূপ। মাথা ঘিরে প্রভা। দুপাশে দুটি সহচর দেবতা (হয়গ্রীব ও যমান্তক?)। চিত্র নং ৩৬ দ্রষ্টব্য।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. XV-XVI.

পৃঃ ১০৭ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

২৯। বজ্রপাণি—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

নীল বর্ণের দেবতা পদ্মের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট। ডান হাতে বজ্র, বাঁ হাত হাঁটুর উপর ন্যস্ত। দুপাশে দুটি সহচর দেবতা—একজন হয়তো যমান্তক, অপরজন হয়গ্রীব।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. LVII-LVIII.

পৃঃ ১১০ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

৩০। লোকনাথ—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

ললিতাসনে উপবিষ্ট দেবতার গায়ের রঙ সাদা। ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে ধরে আছেন সনাল প্রস্ফুটিত কমল। দুপাশে আছেন সুধনকুমার ও হয়গ্রীব। পেছনে লাল রঙের প্রভা-মণ্ডল আর কাল রঙের পশ্চাৎপট। চিত্র নং ৩৪ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১১৩ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

৩১। অরপচন-মণ্ডল—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসর (দ্বাদশ শতকের অন্ত্য)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

মঞ্জুশ্রীর একটি রূপ অরপচন। কাল রঙের পশ্চাৎপটে লাল রঙের বৃত্তক্ষেত্রে আছে পাঁচটি দেবতার মূর্তি। কেন্দ্রস্থলে দেখা যায় বজ্রপর্যঙ্কে আসীন দেব মূর্তি—ডান হাতে উদ্যত খড়্গ আর বাঁ হাতে হৃদিলগ্ন পুস্তক। এটি মঞ্জুশ্রীর অরপচন রূপ। উপরে, নীচে, ডাইনে আর বাঁয়ে দেখা যায় অনুরূপ দেব

মূর্তি। এই পাঁচটি দেবতা মিলে হয়েছে অরপচন-মণ্ডল।
S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. XX-XXI, XLIV.

পৃঃ ১১৬ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

৩২। দেবী—লক্ষ্মণসেন-গতসম্বৎ ৪ (দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ)। ভারত কলা ভবন, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

পুঁথির পাতার মধ্যাংশ। চিত্রে আছে পীত বর্ণের এক দেবী মূর্তি। বজ্রপর্যঙ্কে আসীনা দেবীর ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে সনাল পদ্ম। লাল রঙের পশ্চাৎপট। চিত্রটি মনে হয় ভগবতী তারার একটি রূপ।

লেখার বিপরীতে আঁকা চিত্র আরও কয়েকখানি পাতায় দেখা যায় এই পুঁথিতে। এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ১৬০, ১৬২)।

পৃঃ ১১৯ ভারত কলা ভবনের সৌজন্যে

৩৩। অমোঘসিদ্ধি—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

বজ্রপর্যঙ্কে উপবিষ্ট এই ধ্যানী বুদ্ধের দেহের বর্ণ শ্যাম। ডান হাতে অভয় মুদ্রা, বাঁ হাত কোলের উপর ন্যস্ত।

পৃঃ ১২২ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৪। লোকনাথ—দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

ধবল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট। ডান হাতে বরদ মুদ্রা, বাঁ হাতে সনাল পদ্ম। চিত্র নং ৩০ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১২৫ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৫। মঞ্জুঘোষ—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

পীত-বরণ দেবতা সিংহের উপর অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট। দুহাতে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। দুপাশে দুটি সনাল উৎপল। জটাবন্ধ কেশপাশ। দেবতার ডান হাঁটুর পাশে সিংহের মাথা দেখা যাচ্ছে।
S. K. Saraswati, *Op-cit.*, p. XXIII.

পৃঃ ১২৮ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৬। মৈত্রেয়—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

পীত-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট। ডান হাত হৃদিলগ্ন, বাঁ হাত হাঁটুর উপর ন্যস্ত, তাতে ধরে আছেন সনাল পুষ্প (নাগকেশর)। মাথায় জটাভার, তার সামনে ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ। চিত্র নং ২৮ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৩১ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৭। দেবী—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

দেবী অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্টা। ডান হাত বুকের কাছে ধরা, আয়ুধ অস্পষ্ট; বাঁ হাতে পুস্তক। মাথায় রত্নললাটিকা, সর্বাঙ্গে রত্নাভরণ। অস্পষ্টতার দরুন দেবীর সঠিক রূপ নির্ণয় করা কঠিন।

পৃঃ ১৩৪ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৮। দেবতা—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট। ডান হাত বুকের কাছে ধরা, আয়ুধ অস্পষ্ট, বাঁ হাতে সনাল উৎপল। ডান হাতে বজ্র থাকলে এটি বজ্রপাণির রূপ বলে মনে করা যেতে পারে।

পৃঃ ১৩৭ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৩৯। দেবতা—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীল-বরণ দেবতা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট। ডান হাত ঘাড়ের কাছে তোলা, আয়ুধ অস্পষ্ট, বাঁ হাতে সনাল উৎপল। দেবতার রূপ নির্ণয় সম্ভব হয়নি।

পৃঃ ১৪০ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৪০। দেবী—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

নীল-বরণা দেবী বজ্রপর্যঙ্কে উপবিষ্টা। ছয় হাত: আয়ুধ অস্পষ্ট। শুধু উপরের ডান হাতে বজ্র, আর বাঁয়ের দুটি হাতে তর্জনী মুদ্রা আর কর্তিত শির চেনা যায়। চিত্রটি কোন তান্ত্রিক দেবীর রূপ হতে পারে।

পৃঃ ১৪৩ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৪১। মহামন্ত্রানুসারিণী—শকাব্দ ১২১১/খৃঃ ১২৮৯। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

দেবী ললিতাসনে উপবিষ্টা। ত্রিনেত্র-শোভিত এক মাথা। চার হাত: ডাইনে—কুর্তৃ (?), বজ্র (?): বাঁয়ে—দু হাতের আয়ুধই অস্পষ্ট। পঞ্চরক্ষার পুঁথির অন্তর্গত এ চিত্র কোন রক্ষা মহাদেবীর হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সাধনমালার বিবরণী মতে (নং ১৯৯) এটি মহামন্ত্রানুসারিণীর চিত্র হতে পারে।

চিত্রাঙ্কনের দুর্বলতা ও স্থূলতা বেশ স্পষ্ট—পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলার অবক্ষয়ের পুরো লক্ষণ দেখা যায় এই পুঁথির চিত্রে।

পৃঃ ১৪৬ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৪২। মহামন্ত্রানুসারিণী—নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ৩৮৫/খৃঃ ১২৬৫। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

নীল-বরণা দেবী লাল রঙের প্রভা-মণ্ডলের পশ্চাৎপটে অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্টা। চার মাথা: মূল—নীল,

ডান—সাদা, বাঁ—লাল ও হলুদ। আট হাত: ডাইনে—বজ্র, কর্তৃ, বাণ, অংকুশ; বাঁয়ে—পরশু, ধনুক, বাকী দুটি হাতের আয়ুধ অস্পষ্ট। সামনে উপাসক। নিষ্পন্নযোগাবলী ও ধর্মকোষ-সংগ্রহের বিবরণ মতে এটি মহামন্ত্রানুসারিণীর রূপ হতে পারে।

পৃঃ ১৪৯ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৪৩। ভৃকুটী তারা— নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৩৫/খৃীঃ ১০১৫। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

পীত-বরণা দেবী কারুকাজ-মণ্ডিত পালংকে ফুলওয়ারী উপাধান আশ্রয় করে অর্ধশয়ানা। চার হাত · মূল হাত দুটিতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা; অন্য ডান হাতে বন্দনা মুদ্রা সম্ভবতঃ অক্ষসূত্র সহ, অন্য বাঁ হাতে পুস্তক। তিন সহচরী, প্রত্যেকে উপাসনার ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা।

দেবীর পরিচয়-লিপিতে তাঁকে বলা হয়েছে 'শ্রী-পোতলকে ভৃকুটী তারা'। সাধনমালা প্রভৃতি গ্রন্থে ভৃকুটী বৌদ্ধ প্রতিমা-মণ্ডলীর এক প্রধানা দেবী রূপে বর্ণিতা হয়েছেন, কখনও অন্য দেবতার সহচরী দেবী রূপে, কখনও স্বতন্ত্র দেবী রূপে। তাঁর চতুর্ভুজা রূপেরও বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন বিবরণের সংগে আমাদের চিত্রের দেবীর পুরো মিল দেখা যায় না। লিপিতে দেবীর পরিচয় স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে ভৃকুটী তারা বলে। পোতলক পর্বতের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও উল্লিখিত হয়েছে। এই পুঁথির অন্য দুটি চিত্রে আমরা পোতলকে লোকনাথ আর পোতলকে ভগবতী তারার রূপ দেখতে পাই। এই দুটি চিত্রেও লোকনাথ ও তারার রূপে দেখা যায় ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। এই সাক্ষ্যে মনে হয় পোতলক-সম্পর্কিত দেব-দেবীদের ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা ছিল একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ভৃকুটী তারার কোন বর্ণনাতেই ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা দেবীর লক্ষণ রূপে উল্লিখিত না হলেও পোতলক পর্বতের সংগে তাঁর এই রূপ সংযুক্ত বলে সংশ্লিষ্ট চিত্রে তাঁকে এই মুদ্রা সহ দেখানো হয়ে থাকতে পারে।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, pp. LXXXIV.

পৃঃ ১৫২ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে

৪৪। মহাশ্রী তারা—নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৯৩/খৃীঃ ১০৭৩। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতা।

হরিত-বরণা দেবী সিংহাসনে সুখাসনে উপবিষ্টা। দু হাতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা, বাঁ হাত বেয়ে উঠেছে সনাল নীলোৎপল। দেবীর পরনে ফুলওয়ারী শাড়ী, দেহ-সজ্জায় কিরীট সহ নানা রত্নময় আভরণ। দু পাশে বিভিন্ন দেব-দেবী, সংখ্যায় দশ, প্রতি পাশে পাঁচজন করে। দুজন দেবী প্রতি পাশে: ডাইনে—অশোককান্তা, মহামায়ূরী; বাঁয়ে—একজটা, জাঙ্গুলী। মহাশ্রী তারার এই চার সহচরী দেবীর উল্লেখ আছে সাধনমালার ১১৬ নং সাধনে। প্রতি পাশে তিনজন করে দেবতাদের মধ্যে চেনা যায় অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়। এ সব দেবতাদের উল্লেখ সাধনমালার বর্ণনায় পাওয়া যায় না। (চিত্র নং ৩, ১৯, ২১ ও ৫৩ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ১৫৫ সংগ্রহের মালিকের সৌজন্যে

৪৫। ধর্মদেশনা—নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৯৩/খ্রীঃ ১০৭৩। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতা।

পরিচয়-লিপি মতে এটি ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনার চিত্র। কথিত আছে বুদ্ধদেব মাতার ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গিয়েছিলেন, আর সেখানে ধর্মপ্রচার করে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন সংকাশ্য নগরে। এ চিত্রে বুদ্ধদেবকে একটি সমাবেশে ধর্ম ব্যাখ্যান করছেন অবস্থায় দেখানো হয়েছে। হয়তো এই সমাবেশে তাঁর স্বর্গতা মাতাও আছেন।

পৃঃ ১৫৮ সংগ্রহের মালিকের সৌজন্যে

৪৬। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির চারখানি পত্র—রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের অন্ত্য)। বদলিয়ান গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড।

এই পুঁথিতে আছে ছয়খানি চিত্রিত পাতা, আর দুখানি চিত্রিত পাটা। প্রতি পাতায় আছে তিনখানি চিত্র-ফলক, আর পাতার ছিদ্রস্থানে আছে জ্যামিতিক অলঙ্করণ। উপরের দুটি পাতায় দেখা যায় দু পাশে দুটি বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা, আর মাঝখানে দেব-দেবীর রূপ। নীচের দুটি পাতায় সব ফলকেই দেখা যায় দেব-দেবীর রূপ। আর দুটি পাতায় চিত্র-বিন্যাস উপরের দুটি পাতার অনুরূপ। চিত্র-যুক্ত ও চিত্র-বিহীন পাতায় লেখা আছে ছয় পংক্তি করে।

পৃঃ ১৬১ বদলিয়ান গ্রন্থাগারের সৌজন্যে

৪৭। পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির দুখানি পত্র—হরিবর্মদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের শুরু)। বরোদা সংগ্রহশালা।

প্রতি পাতায় আছে ছয় পংক্তি লেখা, তিনখানি চিত্র আর ছিদ্রস্থানে জ্যামিতিক অলঙ্করণ। নীচের পাতার শেষ পংক্তিতে তারিখ-পুষ্পিকা দেখা যায়।

পৃঃ ১৬৩ বরোদা সংগ্রহশালার সৌজন্যে

৪৮। পুঁথির রেখাচিত্র—আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।
বর্ণালেপনের পূর্বে প্রাথমিক রেখা-কর্ম। এই চিত্রে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-রত বুদ্ধদেবকে দেখানো হয়েছে।
আঙ্গিক-কথা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬৫ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৪৯। পুঁথির রেখাচিত্র—আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

বর্ণালেপনের পূর্বে প্রাথমিক রেখা-কর্ম। এই চিত্রে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ থেকে বুদ্ধের মর্ত্যে অবতরণ দেখানো হয়েছে। চিত্র নং ১৩, ২৭ দ্রষ্টব্য।
আঙ্গিক-কথা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬৭ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৫০। পুঁথির রেখাচিত্র—আঃ একাদশ শতক। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

বর্ণালেপনের পূর্বে প্রাথমিক রেখা-কর্ম। এই চিত্রে নালগিরি-বশীকরণ দেখানো হয়েছে। চিত্র নং ৫, ১১ দ্রষ্টব্য।

আঙ্গিক-কথা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬৯ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৫১। ভগবান বুদ্ধের জন্ম—প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্ক (দশম শতকের শেষ পাদ)। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার।

রঙীন প্রতিলিপি ৪ নং চিত্রে।

পৃঃ ১৭১ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

৫২। প্রজ্ঞাপারমিতা—রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্ক (একাদশ শতকের অন্ত্য)। বদলিয়ান গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড।

পুঁথির পাটার চিত্র। চতুর্ভুজা দেবী রত্নময় সিংহাসনে বজ্রপর্যঙ্কে উপবিষ্টা। মূল দুই হাতে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা; অতিরিক্ত ডান হাতে অক্ষমালা আর অতিরিক্ত বাঁ হাতে পুস্তক। দেবীর এই রূপ দেখা যায় আরও কয়েকখানি চিত্রিত পুঁথিতে, যেমন দ্বিতীয় মহীপালদেবের পুঁথির পাটায় (চিত্র নং ৩), ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দের নেপালী পুঁথির পাটায় (গ তালিকায় ২ নং), ইত্যাদি। ধর্মকোষ-সংগ্রহে এই রূপের বর্ণনা আছে। সাধনমালা বা নিষ্পন্নযোগাবলীতে চতুর্ভুজা প্রজ্ঞাপারমিতার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে সামান্য অমিল দেখা যায় দেবীর এই চিত্রিত রূপে।

S. K. Saraswati, *Op-cit.*, p.·L.

পৃঃ ১৭৩ বদলিয়ান গ্রন্থাগারের সৌজন্যে

৫৩। মহাশ্রী তারা—রামপালদেবের ষট্‌ত্রিংশত্তম রাজ্যাঙ্ক (দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ)। ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ম, লণ্ডন।

দ্বিভুজা দেবী সিংহাসনে সুখাসনে উপবিষ্টা। দুই হাতে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা। পরনে ফুলওয়ারী শাড়ী ও কঞ্চুক। সামনে আরাধনা-রত দুই সহচরী দেবী। চিত্র নং ৩, ১৯, ২১ ও ৪৪ দ্রষ্টব্য। (সাধনমালা নং ১১৬)।

পৃঃ ১৭৫ ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মের সৌজন্যে

৫৪। বসুধারা—রামপালদেবের ষট্‌ত্রিংশত্তম রাজ্যাঙ্ক (দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ)। ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ম, লণ্ডন।

ষড়ভুজা দেবী ললিতাসনে উপবিষ্টা। ডাইনের হাতে (নীচ থেকে)—বরদ মুদ্রা, রত্ন ও বন্দনা বা নমস্কার মুদ্রা; বাঁ হাতে (নীচ থেকে)—ভদ্রঘট, শস্যমঞ্জরী ও পুস্তক। বসুধারার ষড়ভুজা রূপ ভাস্কর্যে ও চিত্রে

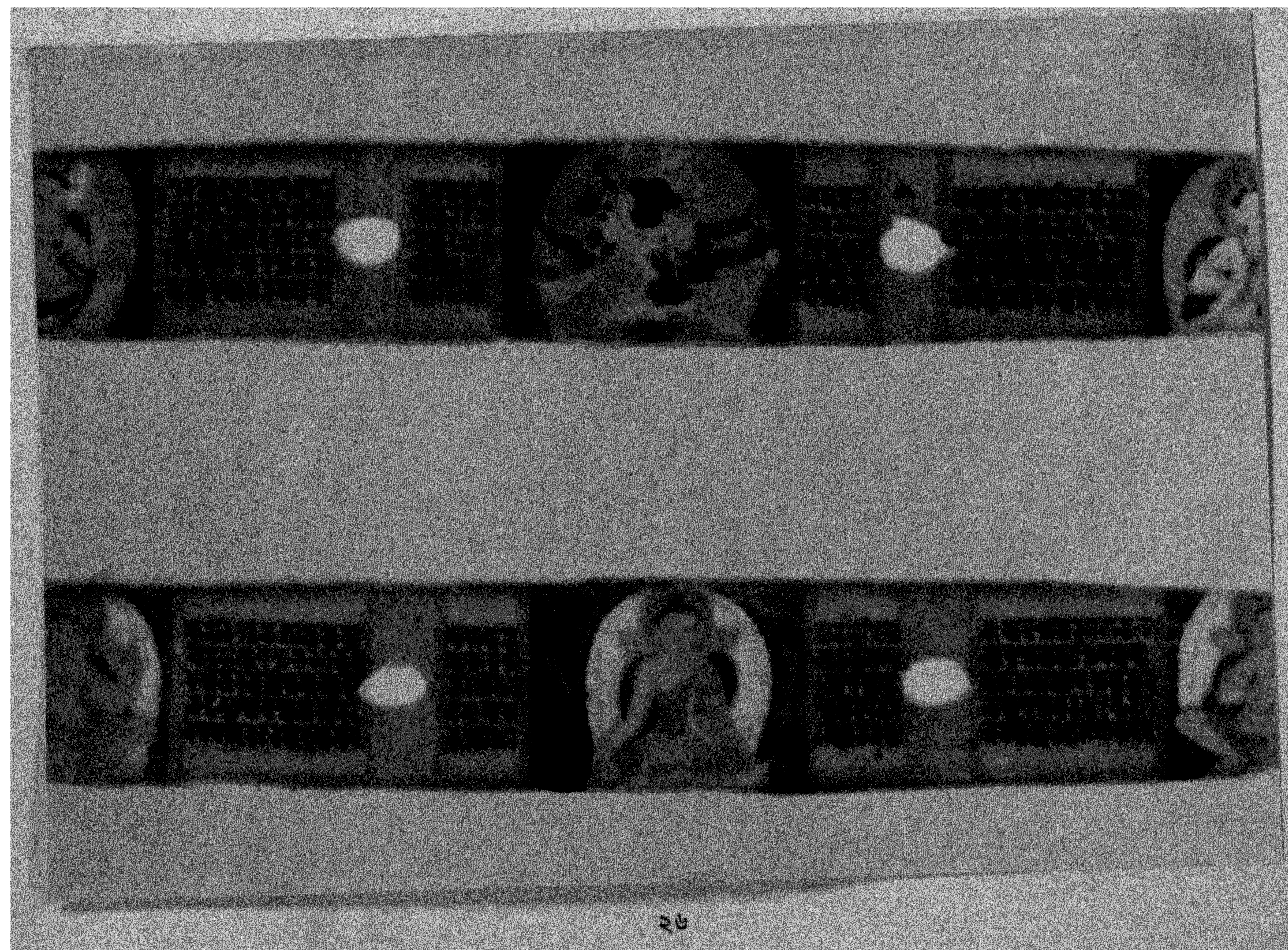
বেশ কিছু দেখা যায়। কিন্তু সাধনমালা বা নিষ্পন্নযোগাবলীতে এই রূপের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ক্রিয়াকান্ড-সম্বন্ধীয় পুঁথিতে ও ধর্মকোষ-সংগ্রহে এই ষড়ভূজা রূপের বর্ণনা আছে।
S. K. Saraswati, *Op-cit.*, p. LIV.

পৃঃ ১৭৭ ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মের সৌজন্যে

৫৫। বুদ্ধদেব—নেপাল। নেপাল-সম্বৎ ১৩৫/খ্রীঃ ১০১৫। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

এই চিত্রে বুদ্ধদেবকে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-রত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে মন্দিরে। আর এই মন্দিরের নকশার জন্যই চিত্রখানি তাৎপর্য-পূর্ণ। পরিচয় দেওয়া হয়েছে চিত্রটির—'পুণ্ড্রবর্ধনে ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারকঃ'। মন্দিরটি অবস্থিত ছিল উত্তর বঙ্গে। মন্দিরটি নূতন ধরনের। ধাপে ধাপে চাল, তার উপরে নাগর রীতির শিখর। নাম দেওয়া যেতে পারে—শিখর-শীর্ষ ভদ্র মন্দির। এই রীতির মন্দির যে পূর্ব-ভারতে এককালে বেশ কিছু বিদ্যমান ছিল তা জানা যায় এই পুঁথির আরও কয়েকখানি চিত্র আর কিছু ভাস্কর্য-নিদর্শন থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থাপত্যে এই রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।
S. K. Saraswati, *Architecture of Bengal,* Book I, pp. 74-88.

পৃঃ ১৭৯ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে



॥ এক ॥

কথামুখ

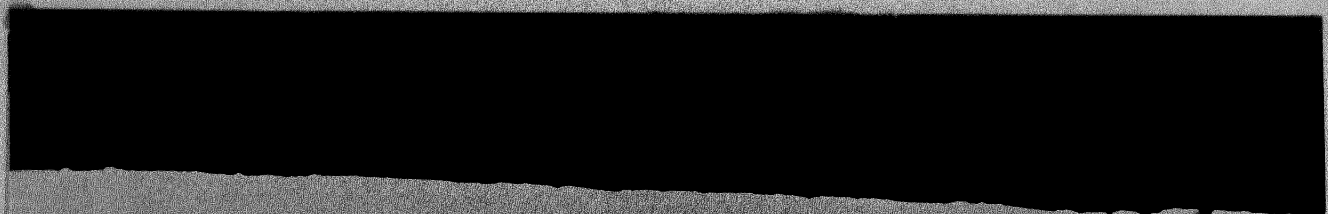
তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির রচনা শেষ হয় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনেক তথ্যের সমাবেশ করেছেন তারনাথ তাঁর এই গ্রন্থে। তবে এই তথ্যসম্ভারের কতটা কিম্বদন্তীমূলক আর কতটা সত্যের ভিত্তির উপর আশ্রিত তা নির্ধারণ করা কঠিন। রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারনাথের তথ্যের উপর সব সময় নির্ভর করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তারনাথের পাল রাজবংশের বিবরণের সঙ্গে এই রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাসের কিছু অনৈক্য দেখা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক যে কিম্বদন্তীর কেন্দ্রবিন্দুরূপে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস থাকা একেবারে অসম্ভব নয়, তবে কালের অমোঘ নিয়মে তার উপর অনেক অপ্রাকৃত আর অবান্তর স্তরের প্রলেপ দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে তারনাথ এমন অনেক তথ্য দিয়েছেন যার সমষ্টিগত সাক্ষ্য অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য।

এই গ্রন্থে তারনাথ প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একটি অংশ পাল যুগের শিল্পকলা সম্পর্কীয়। ধর্মপালদেব ও দেবপালদেবের আমলের ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামে দুই-জন বরেন্দ্রীবাসী শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তারনাথ তাঁর গ্রন্থের এই অংশে। দুইজনই ভাস্কর্যে, ধাতুমূর্তি-গড়নে আর চিত্রকর্মে বিশেষ নিপুণ ও পারদর্শী ছিলেন। তারনাথের মতে পিতা ও পুত্র তখনকার শিল্পকলায় দুটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন। এই দুই রীতির নাম তিনি দিয়েছেন পূর্ব-দেশীয় রীতি ও মধ্য-

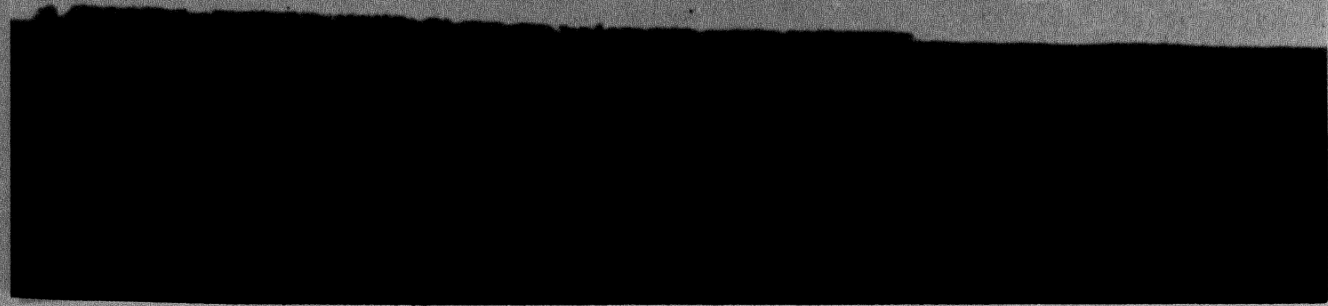
দেশীয় রীতি। ভাস্কর্যে আর ধাতুমূর্তি-গড়নে বীতপালকে পূর্ব-দেশীয় রীতির ও ধীমানকে মধ্য-দেশীয় রীতির প্রবর্তক বলা হয়েছে; চিত্রকর্মে পূর্ব-দেশীয় ও মধ্য-দেশীয় রীতির প্রবর্তক হচ্ছেন যথাক্রমে ধীমান ও বীতপাল। তারনাথ আরও বলেছেন যে নেপালী ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম পূর্ব-দেশীয় রীতির অনুসরণে গড়ে উঠেছে।

তারনাথ অবশ্য পিতা ও পুত্র প্রবর্তিত দুটি রীতির বৈশিষ্ট্য বা পরস্পরের মধ্যে আঙ্গিক বা গুণগত পার্থক্যের কোন উল্লেখ করেননি। পিতা ও পুত্রের দুটি রীতির তিনি পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে পিতা ও পুত্রের শিষ্য ও অনুগামীদের আবাসস্থল আর কর্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে। এই বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিভাগ সম্পর্কে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী মগধ ছিল মধ্য-দেশের অন্তর্ভুক্ত, আর তার পূর্ববর্তী সমস্ত অঞ্চল প্রাচ্য বা পূর্ব-দেশের অন্তর্গত। এই ধারণার বশে পাল যুগের মগধ আর তার পূর্বাঞ্চলের শিল্পকর্মকে মধ্য-দেশীয় ও পূর্ব-দেশীয় রীতির পরিচায়ক রূপে তারনাথ বর্ণনা করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মত বিচারে প্রাচীন বা মধ্য যুগে এই দুই অঞ্চলের শিল্পকর্মের শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে প্রয়াগ (এলাহাবাদ—মনুসংহিতা) বা বারাণসী (কাশী—রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা) মধ্য-দেশের পূর্বসীমা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। আর এই সীমার পূর্ববর্তী সমস্ত ভূখণ্ডকেই বলা হত প্রাচ্য বা পূর্ব-দেশ। এই মতে মগধ ও তার পূর্ববর্তী সব অঞ্চলই ছিল প্রাচ্য বা পূর্ব-দেশের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিভাগ সম্পর্কে দীর্ঘকাল স্বীকৃত ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মগধ ও তার পূর্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পকৃতিকে দুই পৃথক রীতির পর্যায়ভুক্ত করা যায় না যদি না তাদের আঙ্গিক ও গুণগত বিভেদ স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়। পাল সম্রাটদের







যুগে মগধ সহ সমগ্র পূর্ব-দেশে গড়ে উঠেছিল একটি একক সত্তা। এই একক সত্তা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি দেখা যায় সে যুগের ধর্মধারণায় আর সংস্কৃতিবিষয়ক অবদানে। তাছাড়া আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। সে যুগে শিল্প কুশলতা ও শিল্প ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বংশ-পরম্পরায়—পিতা হতে পুত্রে, ও গোষ্ঠীপরম্পরায়—গুরু হতে শিষ্যে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পিতা আর পুত্র সমসময়ে দুটি পৃথক শিল্পরীতির প্রবর্তন করেছিলেন একথা স্বতঃই বিশ্বাস করা কঠিন। 'ভারত-ভাস্কর্য' নামক গ্রন্থে বর্তমান লেখক পালযুগের ভাস্কর্যকলায় মগধ সহ সমস্ত পূর্বাঞ্চলের শিল্পকৃতিতে একটা মৌল ঐক্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চিত্রকলাতেও সমস্ত পূর্বাঞ্চলের কর্মকৃতির মধ্যে অনুরূপ ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। শিল্পবিচারের আদর্শে, পাল যুগে অন্ততঃ, মগধ ও তার পূর্বাঞ্চলের শিল্পকৃতিকে দুটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতিতে বিভাগ করা চলে না। এইসব দৃষ্টিতে তারনাথের গ্রন্থে মগধের শিল্প সম্পর্কে মধ্য-দেশীয় রীতির উল্লেখ অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বলেই স্বীকার করতে হবে।

তারনাথের বিবরণ থেকে আমরা এই সত্যের সন্ধান পাই যে ধর্মপালদেব ও দেব-পালদেবের আমলে (আনুমানিক নবম শতকের প্রারম্ভকালে) দুইজন কুশলী শিল্পী, ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল, পূর্ব-ভারতে এক নূতন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন, আর এই রীতি মগধ আর তার পূর্বাঞ্চলে সমভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তারনাথ তাঁর গ্রন্থের এক অংশে মগধ ও তার পূর্বাঞ্চলের শিল্পকৃতিকে মূলতঃ পূর্ব-ভারতীয় শিল্পরীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এই বর্ণনা আমাদের সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। এই রীতির সঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ব-ভারতীয় বা পূর্ব-দেশীয় রীতি। পাল যুগে এই রীতির উদ্ভব ও বিকাশ, সেকারণে এই রীতি পাল যুগের শিল্পরীতি নামেও অভি-হিত হতে পারে। দুটি ক্ষেত্রে এই রীতির প্রকাশ দেখা যায়—একটি ভাস্কর্যে ও ধাতু-মূর্তি-গড়নে, আর একটি চিত্রকর্মে। পিতা ও পুত্র দুজনেই শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান ভাবে কুশলী ও পারদর্শী ছিলেন বলে অভিহিত হয়েছেন। এই কারণে

বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের কর্মকৃতির মধ্যে একটা মৌলিক ও সামগ্রিক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সাদৃশ্য মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

পাল যুগের ভাস্কর্য-শিল্পের সঙ্গে অল্পাবিস্তর পরিচয় সকলেরই আছে। কিছু-সংখ্যক নিদর্শন দেশের বাইরে চলে গেলেও দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পাল-ভাস্কর্যের যে নিদর্শন রক্ষিত আছে তার সংখ্যা নিতান্ত অপ্রচুর নয়। ব্যক্তিগত সংগ্রহাগারে আর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ছড়িয়ে আছে বহুসংখ্যক নিদর্শন। এসব উপকরণ যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে সহজেই অধিগম্য। পাল যুগের চিত্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ বা অবকাশ অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ। এ কারণে এই চিত্রকলা ততটা সুপরিচিত নয়। এ চিত্রকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায়, আর কিছু আছে ব্যক্তিগত ভান্ডারে। বেশীর ভাগ নিদর্শনই চলে গেছে দেশের বাইরে। এ সব নিদর্শন সাধারণের একান্তভাবে দুরধিগম্য। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিটি সংগ্রহে এ সব বস্তুর বিশেষ ধরনের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ব্যবস্থার ফলে এই দুরধিগম্যতা বৃদ্ধিই পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোন কোন সংগ্রহের কর্তৃপক্ষের অনুদারতার দরুণ এ সব নিদর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশও অত্যন্ত সীমিত।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে পাল যুগের চিত্রকৃতির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আর এই চিত্রকৃতি বিষয়বস্তু ও গুণগত সৌকর্যে কম সমৃদ্ধ নয়। আজ পর্যন্ত যে সব নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে তার সংখ্যাও কম সমৃদ্ধ নয়। অথচ ভারতীয় শিল্পকলা বা চিত্রকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে পাল চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনা অবিশ্বাস্য রকমে সংক্ষিপ্ত। নিদর্শনের অপ্রতুলতা নয়, নিদর্শনের দুরধিগম্যতাই এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই কারণে এই পুস্তিকায় পাল চিত্রকলার কিছু পরিচয় দেবার মানস করেছি।

পাল যুগের চিত্রকলার নিদর্শন আমরা পাই সে সময়কার চিত্র-সংযুক্ত পুঁথিতে। দুএকখানি ছাড়া পুঁথিগুলি সবই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি, পাল সম্রাটদের যুগে





পূর্ব-ভারতে প্রস্তুত হয়েছিল। অধিকাংশ পুঁথিতেই বিভিন্ন পাল সম্রাটদের নামাঙ্কিত তারিখ দেখা যায়। কতকগুলিতে পাওয়া যায় সমসাময়িক অন্য রাজাদের তারিখ। কয়েকখানিতে আবার তারিখ দেখা যায় তখনকার প্রচলিত অব্দে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ পাদ হতে দ্বাদশ শতকের অন্ত অবধি কম করে পঁচিশখানি তারিখযুক্ত চিত্রিত পুঁথির সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মোট চিত্রসংখ্যা তার প্রায় চারশ। অনেক পুঁথিরই চিত্রিত কাঠের পাটা বিদ্যমান—আমাদের হিসাবে অবশ্য পাটার চিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ পাটার চিত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের মনে করবার সঙ্গত যুক্তি আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালের তারিখ-যুক্ত তিনখানি চিত্রিত পুঁথি মুসলমান শাসনের যুগে পূর্ব-ভারতে এই চিত্ররীতির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। তখন অবশ্য পূর্ব সৌষ্ঠবের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

তারিখ-যুক্ত চিত্রিত পুঁথি ছাড়াও তারিখ-বিহীন পূর্ব-ভারতীয় চিত্রিত পুঁথিও কিছু বিদ্যমান আছে। খণ্ডিত অবস্থার দরুন এ সব পুঁথিতে তারিখ পাওয়া যায় না। তারিখ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারে এগুলিও পাল আমলের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। এছাড়া তারিখ-যুক্ত ও তারিখ-বিহীন নেপালী চিত্রিত পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। নেপালী চিত্রকর্মে পূর্ব-ভারতীয় রীতি অনুসৃত হয়েছিল—তারনাথের এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির আলোচনায় তুলনীয় উপাদান হিসেবে নেপালী পুঁথিচিত্রের তাৎপর্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে পাল যুগের চিত্রকলা বা পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতি সম্পর্কীয় আলোচনার আবশ্যকীয় উপাদান সম্ভারের যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে। এ রীতির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই সব চিত্রিত পুঁথির বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে B. H. Hodgson কর্তৃক নেপালে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ দেওয়া

হয়েছে। Hodgson সাহেবের সংগ্রহের একটা অংশ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আছে সেই সংগ্রহের বিশদ পরিচয়। Hodgson সাহেবের সংগৃহীত পুঁথির আর একটি অংশ যায় Cambridge University Libraryতে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে Cecil Bendall তার তালিকা প্রকাশ করেন Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge নামক গ্রন্থে। এই দুই তালিকা-গ্রন্থের প্রকাশে এসব পুঁথি ও তার চিত্রের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অন্তে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে পূর্ব-ভারতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে পূর্ব-ভারতীয় অধিকাংশ পুঁথিই চলে যায় নেপালে, কিছু যায় তিব্বতে। ফলে এগুলি রক্ষা পায় অনিবার্য ধ্বংসের পরিণাম থেকে। অকরুণ কালের প্রকোপ থেকেও রক্ষা পায় পুঁথিগুলি নেপাল ও তিব্বতের হিমশীতল আবহাওয়ায়। এই দুই উৎস থেকে নানা দেশের গ্রন্থাগার আর সংগ্রহশালা আহরণ করেছে এই পুঁথিসম্ভার। তার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্রপত্রিকায় আর বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার তালিকা-গ্রন্থে। কিন্তু এ পরিচয় নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ধরনের—সংশ্লিষ্ট পুঁথি সম্বন্ধীয়। এই শতকের শুরুতে ফরাসী পণ্ডিত A. Foucher বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের আলোচনা করেন, বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে, এইরূপ কয়েকখানি পুঁথিচিত্রের অবলম্বনে (Etude sur l'Iconographie Bouddhique de l'Inde, pts. 1 and 2, Paris, 1900 & 1905).

আগেই বলা হয়েছে এই পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট পুঁথির চিত্রের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে। বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় এসব পুঁথিচিত্রের গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট—আর এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। বর্তমান, লেখক এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে (Tantrayana Art : An Album, Calcutta, 1977)। চিত্ররীতির বিচার বিশ্লেষণ



সম্পর্কে আলোচনা আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তাও খুব সামান্য ও বিচ্ছিন্ন ধরনের। সামগ্রিক দৃষ্টিতে চিত্রকলার রীতি বিচারের কোন প্রয়াসই এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই নেপালী উপাদানের ভিত্তিতে আশ্রিত। পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্র প্রেরণা জুগিয়েছে এই চিত্ররীতির প্রবর্তন ও ক্রমবিকাশে। অথচ এই ধরনের আলোচনায় পূর্ব-ভারতীয় উপাদানগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত Eastern Indian Manuscript Painting (Bombay, 1972) নামক গ্রন্থটির এক অংশে পাল চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনাটিও একই পথের অনুসরণ করেছে। উপরন্তু, এই আলোচনায় তথ্যাদির উল্লেখে অনেক ভ্রান্তি দেখা যায়। মূল নিদর্শনের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় ঘটেছে এই ধরনের প্রমাদ। রীতি বিচারে দেখা যায় পরস্পর-অসংলগ্ন উদ্ধৃতির সমাবেশ। ফলে এ বিচারও ত্রুটিশূন্য নয়। চিত্ররীতি ও মূর্তিতত্ত্ব দুদিক থেকেই পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্রের বা পাল যুগের চিত্রকলার সামগ্রিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় এসব কারণে।

এই পুস্তিকায় এই চিত্ররীতির কয়েকটা মৌল দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের প্রয়াস করা হয়েছে। 'নিদর্শন-কথা' নামে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এই চিত্ররীতির নিদর্শনসমূহ যথাযথ পরীক্ষা করে তাদের কালপঞ্জী ও পৌর্বাপর্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। 'আঙ্গিক-কথা' নামে তৃতীয় অনুচ্ছেদে পুঁথি-প্রস্তুতি ও চিত্রাঙ্কনের বিধি ও প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছে কয়েকখানি শিল্পগ্রন্থের তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে। 'চিত্র-কথা' নামে পরের অনুচ্ছেদে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে পুঁথি ও তার চিত্রের মধ্যে আপাতবিরোধ সম্পর্কে, পরে আছে এই চিত্ররীতির সামগ্রিক বিচার ও বিশ্লেষণ। শেষে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক অন্য চিত্ররীতির সঙ্গে এই চিত্ররীতির তুলনামূলক আলোচনা।

॥ দুই ॥

নিদর্শন-কথা

আলোচনার শুরুতে পাল যুগের চিত্রকলার নিদর্শন সমূহের পরিচয় দেবার আবশ্যকতা আছে। আগেই বলা হয়েছে এই চিত্রকৃতির নিদর্শন এখন পাওয়া যায় সে যুগের পুঁথিচিত্রে। আর এই নিদর্শন-সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। নিদর্শন-সমূহের তালিকা আমাদের আলোচনার ভিত্তি স্বরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না। এই তালিকা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে।

(ক) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি।

(খ) তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি।

(গ) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি।

এ ছাড়াও আছে কিছু-সংখ্যক তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি।

(ক) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি

১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—(প্রথম) মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে লিখিত। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। চার পত্রে বারখানি চিত্র। চিত্রিত পাটা (সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের)।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ তাড়িবাড়ী-মহাবিহারীয় আবস্থিতেন শাক্যাচার্য স্থবির সাধুগুপ্তস্য। যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়



মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌগত শ্রীমদ্‌বিগ্রহপালদেব-পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌগত শ্রীমন্‌মহীপালদেব-প্রবর্ধমান-কল্যাণবিজয়রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে ৬ কার্তিক-কৃষ্ণত্রয়োদশ্যা-ন্তিথৌ মঙ্গলবারে ভট্টারিকা নিষ্পাদিতা ইতি। শ্রী-নালন্দাবস্থিত কল্যাণচিন্তা-মাণিক্যস্য লিখিতা ইতি।

Asiatic Society, Calcutta No. G. 4713 (H. P. Sastri, *A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. I, pp. 1-2).

২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—(প্রথম) মহীপালদেবের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। দ্বারবঙ্গের এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারের সংগ্রহ—বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। ১৪ পত্রে ৪২ খানি চিত্র। ১৯৫৪ সালে লেখক পুঁথিখানি পরীক্ষা করেছেন পুষ্পিকাসহ।

তারিখ-পুষ্পিকা—পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত শ্রীমদ্‌-বিগ্রহপালদেব-পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত শ্রীমন্‌মহীপালদেব-কল্যাণবিজয়রাজ্যে সপ্তম সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে ৭ মার্গশীর্ষ-কৃষ্ণসপ্তম্যাং লিখিতেয়ং ভগবতী।

৩। ধর্ম-গ্রন্থ—(প্রথম) মহীপালদেবের সপ্তবিংশতিতম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। পাটনার স্বর্গত রাধাকৃষ্ণ জালান মহাশয়ের সংগ্রহ—বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত। প্রচুর চিত্র-সংবলিত। (সময়াভাবে সূক্ষ্ম পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়নি)।

৪। পঞ্চরক্ষা—গোবিন্দচন্দ্রদেবের রাজ্যকালে লিখিত (সম্বৎসরের অঙ্কটি এখন

লুপ্ত)। পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন এই পুঁথির পরিচয় প্রকাশ করেছেন। চিত্র-সংখ্যার উল্লেখ করেননি।

তারিখ-পুষ্পিকা—স্থবির জয়াকরগুপ্তস্য......কল্যাণসহস্রভাজনস্য পরমসৌগত শ্রীমদ্‌গোবিন্দচন্দ্রদেবস্য প্রবর্ধমানবিজয়রা...সংবৎসরে অভিলিখ্যমানং শ্রাবণমাসি শুক্ল-পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ চিত্রানক্ষত্রে...শ্রী-বিক্রম...(।)

(Rahul Sankrityayana, 'Palm leaf Manuscripts in Tibet', *JBORS.*, Vol. XXI, 1935, pp. 21-43).

৫। পঞ্চরক্ষা—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ১২ পত্রে ৩৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীমন্‌নয়পালদেব-প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে সংবৎ ১৪ চৈত্রদিনে লিখিতেয়ং ভট্টারিকা ইতি।

Cambridge University Library, No. Add. 1688 (C. Bendall, *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the University Library*, Cambridge, p. 175).

৬। ধারণী-গ্রন্থ—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে লিখিত। নিউ ইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। ২ পত্রে ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক নেপালী রাম-জীবস্য। যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্ব-রাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌগত শ্রীমন্‌নয়পাল-বিজয়রাজ্যে (সংবৎ)



॥ ১৪ ॥ শ্রী-নালন্দাবস্থিত লেখক স্বমেশ্বরস্য লিখিত ইতি।

(Art of India and Nepal : Nasli and Alice Heeramaneck Collection, No. 111).

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—(দ্বিতীয়) মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৫ পত্রে ১৫ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্ মহীপালদেব-প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে ৫ অশ্বিন-(আশ্বিন-) কৃষ্ণ......।

Cambridge University Library, No. Add. 1464 (C. Bendall, *op. cit.*, pp. 100-01).

৮। আর্য কারণ্ডব্যূহ—রামপালদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে লিখিত। নেপালস্থ পাটনের জয়শ্রী বিহারের তেজনারায়ণ শাক্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। দুখানি চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক শোপাহুসুত সৌবাজেকরস্য। যদত্র পুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল-সত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ রামপালদেব-প্রবর্ধমান-কল্যাণবিজয়রাজ্যে সম্বৎ ২।

(Hemraj Sakya, *Mediaeval Nepal*, pp. 5-6).

৯। পঞ্চরক্ষা—রামপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ২০ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—শ্রীমদ্‌রামপালদেব-রাজ্যসম্বৎ ১।

Bharat Kala Bhavan, fols. marked 4796-4807, 4843-4844—date colophon on No. 4805 (S. K. Saraswati, 'East Indian Manuscript Painting', *Chhavi*, pp. 244, 260-61).

১০। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে লিখিত। অক্সফোর্ডের বদলিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৬ পত্রে ১৮ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

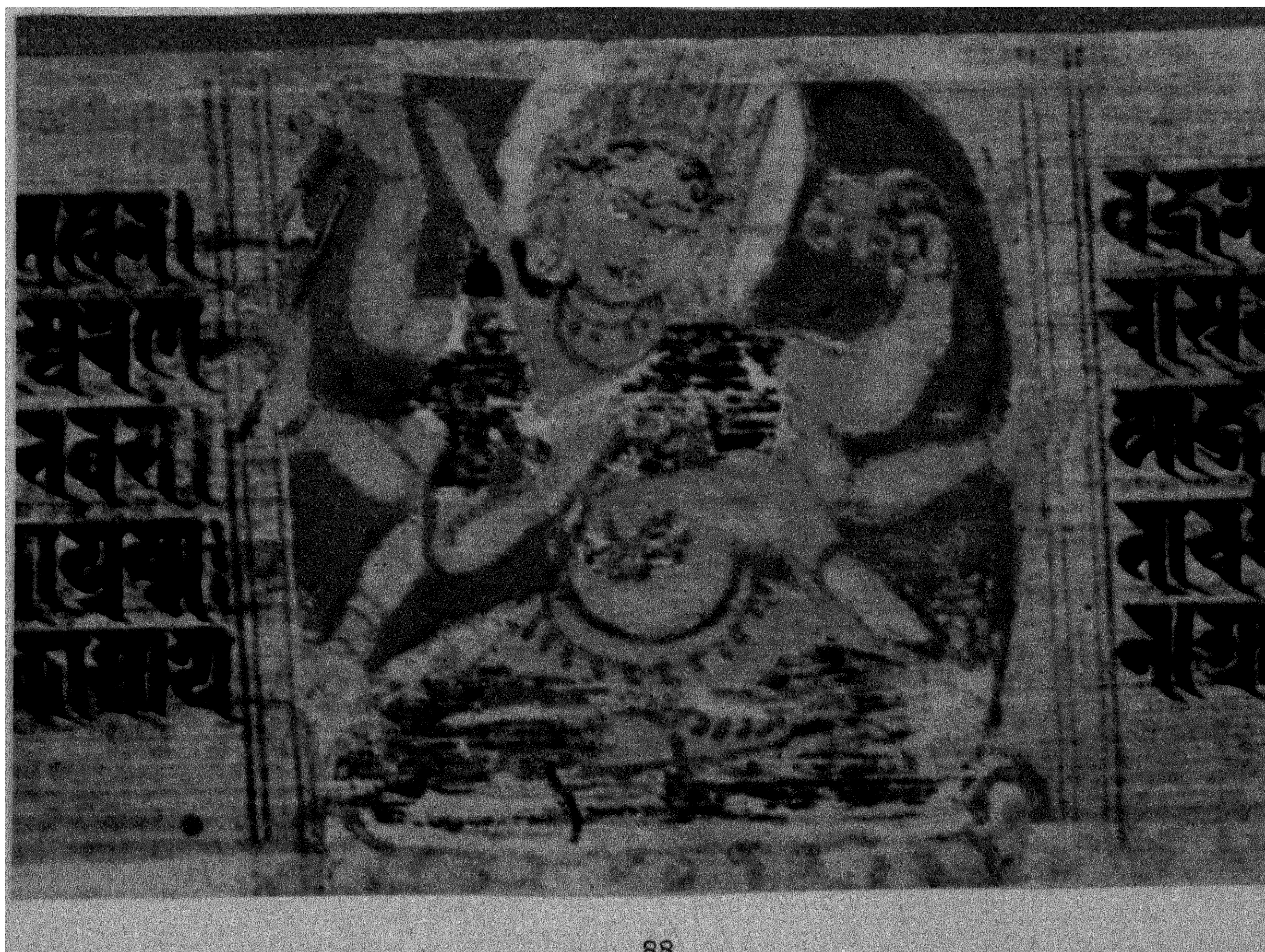
তারিখ-পুষ্পিকা—মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত শ্রীমদ্-রামপালদেব-প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে পঞ্চদশমে সংবৎসরে ব্যাভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি ১৫ বৈশাখদিন-কৃষ্ণসপ্তম্যাং।

Bodleian Library, Oxford, No. Sansk. a.7(R) (*Oriental Art*, Vol. I, No. 1, pp. 5-12).

১১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—রামপালদেবের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে আপনক মহাবিহারে লিখিত। নিউ ইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। ২ পত্রে ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ মলয়দেশবিনির্গত শাক্য-ভিক্ষু স্থবির পূর্ণচন্দ্রস্য অস্য শিষ্য স্থবির ত্রৈলোক্যচন্দ্রস্য (।) যদত্র পুণ্যাং তদ্‌ভবত্বা-চার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥ মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌রামপালদেব-রাজসম্বৎ ॥ ১৮ ॥ শ্রীমদাপনক-মহাবিহারাবস্থিত বমতানক জয়কুমারেণ লিখিত ইতি।

(*Art of India and Nepal : Nasli and Alice Heeramaneck Collection*, No. 112).



১২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—রামপালদেবের ষট্‌ত্রিংশত্তম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। ব্রেডেনবুর্গ সংগ্রহ—বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত। ৭ পত্রে ২১ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ বাসাগারিক রাণক শ্রী-উদয়-সিংহস্য (।) যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল-সত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌রামপালস্য প্রবর্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যসম্বৎ ৩৬ মাঘদিন......।

Victoria and Albert Museum, No. L.S. 4—1958 to L.S. 10—1958 (*Rupam*, Nos. 1 & 2, pp. 5-12).

১৩। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—রামপালদেবের একোনচত্বারিংশত্তম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। নিউ ইয়র্কের শার্লি এম ব্র্যাকের সংগ্রহ। চিত্র-সংখ্যা জানা নেই।

(*Oriental Art*, N.S. XIII, No. 2, pp. 107-12; Correction, *ibid.*, N.S, XIV, No. 2, p. 124).

১৪। পঞ্চরক্ষা—রামপালদেবের ত্রিপঞ্চাশত্তম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। নূতন দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ৪ পত্রে ১২ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—শ্রীমদ্‌রামপালদেব-রাজ্যসম্বৎ ৫৩ বৈশাখদিনে ১৬।

National Museum, New Delhi, No. 67-560.

১৫। পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—হরিবর্মদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। বরোদা সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ২২ পত্রে ২২ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক রামদেবস্য (।) যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তর-জ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥ ॥

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব শ্রীমদ্ হরিবর্মদেব-প্রবর্ধমানবিজয়-রাজ্যে অষ্টমে সম্বৎসরে কার্তিকে মাসি কৃষ্ণম্বাদশ্যান্তিথৌ উত্তরফল্গুণী নক্ষত্রে বুধবারে নিষ্পন্না......মহন্তাবিহারে বোপনেতি।

Baroda Museum and Picture Gallery, No. PG 5 F. 18 (*Bulletin of the Baroda Museum and Picture Gallery*, pt. I, *Handbook of the Collection*, p. 40).

১৬। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—হরিবর্মদেবের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৬ পত্রে ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক শিলাদিৎ (শিলাভিৎ) বকস্য (।) যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক শ্রীমদ্ হরিবর্মদেব-প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে সংবৎ ১৯ বৃহস্পতিবারে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ নিষ্পন্নায়ং ভট্টারিকা ইতি।

(বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অধীক্ষক ডঃ মুকলেসর রহমানের পাঠানো আলোকচিত্রের পাঠ)।

১৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—(তৃতীয়) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত। আমেরিকার বোস্টন সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ৬ পত্রে ১৮ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।



তারিখ-পুষ্পিকা—পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম(সৌগত) মহারাজাধিরাজ......
গোপালদেব-প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যসম্বৎ ৪।

Museum of Fine Arts, Boston, No. 20.589 (*Bulletin of the Museum of Fine Arts,* Boston, LXIII, No. 333).

১৮। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—(তৃতীয়) গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমশীলদেব বিহারে লিখিত। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত রাজাধিরাজ শ্রীমদ্-গোপালদেব-প্রবর্ধমানবিজয়েত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্মিনে (আশ্বিন) দিনে ৪ (।)
শ্রীমদ্ বিক্রমশীলদেব-বিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী।

British Museum, No. Or. 6902 (*JRAS.*, 1910, pp. 150-51).

১৯। পঞ্চরক্ষা—মদনপালদেবের সপ্তদশ রাজসম্বতে লিখিত। নিউ ইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্ এঞ্জেলেসের কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। ২ পত্রে ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোহয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ মহাসামন্তাধিপতি মহা-রাজাধিরাজ মহামাণ্ডলিক শ্রী-রুদ্রমানসুত পরমোপাসক রাজা বিক্রমমানস্য (।) যদত্র পুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞান-বাপ্তয় ইতি ॥
শ্রীমন্ মদনপালস্য রাজসম্বৎ ১৭।

(*Art of India and Nepal : Nasli and Alice Heeramaneck Collection,* No. 116).

২০। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—লক্ষ্মণসেন-গতসম্বতের চতুর্থ বর্ষে লিখিত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ৩০ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—লক্ষ্মণসেন-গতসম্বৎ ৪।

Bharat Kala Bhavan, folios marked 4853-4862, 4913-4927, 5491-5495 (S. K. Saraswati, 'East Indian Manuscript Painting', *Chhavi,* p. 246).

২১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে লিখিত। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৩ পত্রে ৯ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌-গোবিন্দপালস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৯।

(স্নেহাস্পদ ছাত্র ডঃ দীপক ভট্টাচার্যের সৌজন্যে)।

Royal Asiatic Society, London, Hodgson No. 1.

২২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালদেবের অষ্টাদশ বর্ষে লিখিত। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। অন্তিম পত্রে ৩ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ খানোদকীয় যশরাপুরা-বস্থানে বং (?) দানপতি ক্ষান্তিরক্ষিতস্য। যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতা-পিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালস্যাভি......সংবৎ ১৮। চাদ্‌ভরাপাটকাবস্থিত খানোদকীয় যশরা-পুরে আচার্য প্রজ্ঞা............(।)

Asiatic Society, Calcutta, No. G9989A (H. P. Sastri, *op. cit.,* p. 6).



২৩। পঞ্চরক্ষা—গোবিন্দপালদেবের হতরাজ্যসম্বতের দ্বাবিংশ বর্ষে লিখিত। কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত। ৬ পত্রে ৬ খানি চিত্র, প্রতিপত্রে আরও দুখানি।

তারিখ-পুষ্পিকা—শ্রীমদ্ গোবিন্দপালদেব-হতরাজ্যসম্বৎ ২২।

Indian Museum, Calcutta (*Indian Museum Bulletin*, IV. I, pp. 114-16).

২৪। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালদেবের অতীত-রাজ্য সম্বতের ৩২ বর্ষে লিখিত। বোম্বাই-এর এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। চার পত্রে বারখানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা— দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপাসক সাধু ভিক (ভিক্ষু) শ্রী-দেবনিধিকস্য (।) যদত্র পুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি ॥

শ্রীমদ্ গোবিন্দপালস্যাতীতরাজ্যসম্বৎ ৩২ ফাল্গুনদিনে ৩ ॥ শুভমস্তু সর্ব-সত্বানাম্ ॥

Bombay, Asiatic Society, Bhagwanlal Indraji collection of Manuscripts, No. 210, Acc. No. 9.

২৫। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলাভবনে রক্ষিত। ৪ পত্রে ১২ খানি চিত্র। চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা (৫৫০৩ সংখ্যক পত্রে)—

রাজ্ঞো গোমীন্দ্রপালস্য সংবৎসর চতুষ্টয়ে।
শ্রীমতা কাশ্যপেনেয়ং লিখিতাষ্টস(া)হস্রিকা ॥

S. K. Saraswati, East Indian Manuscript Painting, *Chhavi*, pp. 246, 261-62.

২৬। পঞ্চরক্ষা—গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবের রাজত্বকালে ১২১১ শকাব্দে (১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৬ পত্রে ৬ খানি চিত্র।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরযানযায়িনঃ পরমোপাসক সাধু রীয়োকস্য (।) যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশের-নুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি।

পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবকানাং প্রবর্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দা ১২১১ ভাদ্র দি ২।

Asiatic Society No. G. 4078 (H. P. Sastri, *op. cit.*, p. 117).

২৭। কালচক্র তন্ত্র—১৫০৩ বিক্রমাব্দে (১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। দুদিকে চিত্রিত দুখানি পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানানুযায়িনাং শ্রীমৎ শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রীকানাং। যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল-সত্বরাশেরনুত্তরসম্যকসম্বোধিজ্ঞানফললাভায়েতি।

পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ১৫০৩ ভাদ্র দি বুধে লিখাপিতেয়ং শ্রীমৎ ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীকৈঃ। লিখিতেয়ং মগধ-



দেশীয়ক আরগ্রাম-শাসনিক করণকায়স্থ শ্রী-জয়রামদত্তেনেতি কেরক-গ্রামাবস্থিতেন।

Cambridge University Library, No. Add. 1364 (Bendall, *op. cit.*, pp. 67-70; *JRAS.*, 1965, pp. 103-11).

২৮। কারণ্ডব্যূহ—১৫১২ বিক্রমাব্দে (১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত। বোম্বাইয়ের হরিদাস সোয়ালী মহাশয়ের সংগ্রহ। বিচ্ছিন্ন কয়েকখানি চিত্রিত পত্র ও চিত্রিত পাটা।

তারিখ-পুষ্পিকা—দেয়ধর্মোঽয়ং প্রবরমহাযানযায়িন......পরমোপাসক করণ-কায়স্থ শ্রী......বাস্তুকস্য শ্রী-কারণ্ডব্যূহ মহাযান-সূত্ররাজ লিখ্যাপিতেয়ং (।) যৎ পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং (কৃ)ত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফল-প্রাপ্তয় ইতি ॥

সং ১৫১২ কার্তিক বদি ১৩ বুধে হৌণ্ডীগ্রামাবস্থিত মণি......ভাস্করেণ... লিখিতেয়মিতি।

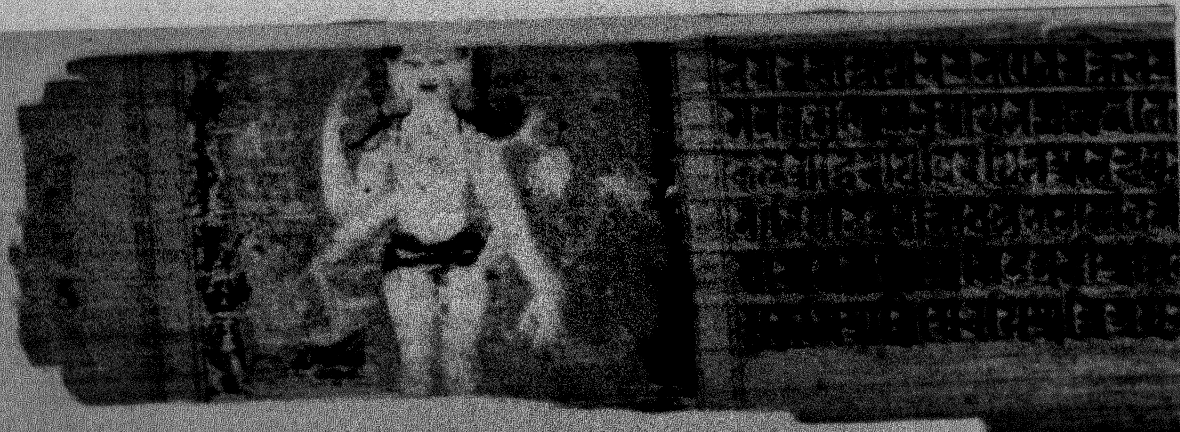
('ছবি'তে প্রকাশিত চিত্র হতে লেখকের সংশোধিত পাঠ)।

(*JAS.*, VIII, 1965, pp. 267-70; *Chhavi*, p. 239 & pls).

। ২ ।

তারিখ-যুক্ত এতগুলি চিত্রিত পুঁথি পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ সন্দেহ নেই। আর কোন ভারতীয় চিত্ররীতির বিচারে এত সংখ্যক তারিখ-সংযুক্ত নিদর্শনের সমাবেশ দেখা যায় না। এই তালিকার একুশ-খানি পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল বিভিন্ন পাল সম্রাটদের রাজত্ব কালে—তাঁদের তারিখ দেখা দেখা যায় এই সব পুঁথিতে। একখানি তৈরী হয়েছিল চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রদেবের







একমাত্র মদনপাল ও গোবিন্দপাল ছাড়া আর কোন পাল নৃপতির রাজ্য লাভের বছর আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা নেই। চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র (তালিকার ৪ নং) ও বর্মবংশীয় হরিবর্ম (তালিকার ১৫ ও ১৬ নং) সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এই কারণে পুঁথিতে উল্লেখিত রাজ্যাঙ্কের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। পুঁথিগুলির তারিখ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সে কারণে কতকাংশে নির্ভর করে অনুমানের উপর। পাল সম্রাটদের কালপঞ্জী সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সম্ভার এখন আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখন অনেক স্পষ্ট। সুতরাং সঠিক তারিখ আর অনুমানগত সিদ্ধান্তের মধ্যে খুব বেশী হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই।

পুঁথিগুলির তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে আরও একটি গুরুতর সমস্যার আলোচনা আবশ্যক। পাল বংশে একই নামের একাধিক রাজা ছিলেন। আমাদের তালিকায় মহীপাল, নয়পাল, রামপাল, গোপাল, মদনপাল, গোবিন্দপাল প্রভৃতি রাজার নামাঙ্কিত তারিখ দেখা যায়। একখানি পুঁথির গোমীন্দ্রপালও সম্ভবতঃ পালবংশীয়ই ছিলেন। পালবংশে মহীপাল নামে দুজন ও গোপাল নামে তিনজন রাজা ছিলেন। একই নামের বিভিন্ন রাজার মধ্যে কালের দূরত্বও কম নয়। মহীপাল-নামাঙ্কিত তারিখ পাওয়া যায় চারখানি পুঁথিতে (তালিকার ১, ২, ৩ ও ৭ নং) আর গোপালের তারিখ দুখানিতে (তালিকার ১৭ ও ১৮ নং)। এই অবস্থায় পুঁথিগুলির তারিখ-নির্ধারণ নির্ভর করে কোন মহীপাল বা কোন গোপালের আমলে সংশ্লিষ্ট পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তের উপর। আবার এও দেখতে হবে এই দুই রাজার নামাঙ্কিত পুঁথিগুলো এই নামের একই রাজার বা বিভিন্ন রাজার শাসনকালে লেখা হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট পুঁথিগুলোর আনুমানিক কাল নিরূপণ করতে পারলে রাজাদের সনাক্তকরণ অনেকাংশে সহজ হতে পারে। এই কাল-নির্ধারণ নির্ভর করে দুটি পরীক্ষাগত প্রমাণের উপর। একটি হচ্ছে লেখার ধরন ও অক্ষরের রূপ পরীক্ষা, আর একটি চিত্র-রীতির বিচার বিশ্লেষণ। এই দুই প্রমাণের মাধ্যমে পুঁথিগুলির আনুমানিক কাল-

নির্ধারণ সম্ভব, আর সেই প্রমাণে এক নামের একাধিক রাজার কোন জনের আমলে পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল সে বিষয়ে সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির ক্ষেত্রে লেখার ধরন বা অক্ষরের রূপ বিশ্লেষণ খুব বেশী সহায়ক হবে বলে মনে হয় না, কারণ ধর্মগ্রন্থের পুঁথিগুলো লেখা হয়েছিল এমন এক ধরনের আলঙ্কারিক লিপিতে যার কোন বিবর্তন বা পরিবর্তন দীর্ঘকালের মধ্যেও লক্ষ করা যায় না। পণ্ডিতেরা এই লিপিকে 'কুটিল' নামে অভিহিত করেছেন। আবার এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পুঁথির কাল বিচারে দু-একটি অক্ষরের রূপ পরিবর্তনের উপর সন্দেহাতীত ভাবে নির্ভর করা চলে না। চিত্ররীতির বিচার বিশ্লেষণ পুঁথির কাল নির্ধারণের পক্ষে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও মূল রীতির গণ্ডীর মধ্যে কিছু কিছু সামান্য পার্থক্য একই পুঁথির চিত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। পরের এক অনুচ্ছেদে চিত্ররীতির বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পুঁথির কাল নির্ধারণ সম্পর্কে চিত্ররীতির সংক্ষিপ্ত বিচার এ স্থানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মহীপালদেব-নামাঙ্কিত রাজ্যাঙ্কের চারখানি পুঁথি (তালিকার ১, ২, ৩ ও ৭ নং) আমাদের নজরে এসেছে। প্রথম তিনখানি পুঁথির চিত্রের সঙ্গে চতুর্থখানির চিত্রের গুণগত প্রভেদ ও পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, সব কটি পুঁথিই এই নামের একই রাজার আমলে প্রস্তুত হয়েছিল কিনা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বিশেষ করে মহীপালদেবের নামাঙ্কিত ষষ্ঠ ও পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের দুখানি পুঁথির (তালিকার ১ ও ৭ নং) উল্লেখ করতে পারি। পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা সকলেই দুখানি পুঁথিই এই নামের একই রাজার সমকালীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁদের মতে তিনি হচ্ছেন এই নামের প্রথম রাজা—অর্থাৎ প্রথম মহীপালদেব। প্রথম মহীপাল-দেব আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর অন্ততঃ ৪৮ বছর রাজত্ব করেন। ১০৮৩ বিক্রমাব্দে (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ সারনাথের এক মূর্তি-লিপির মহীপাল ও পাল সম্রাট প্রথম মহীপালদেব এক ও অভিন্ন বলে





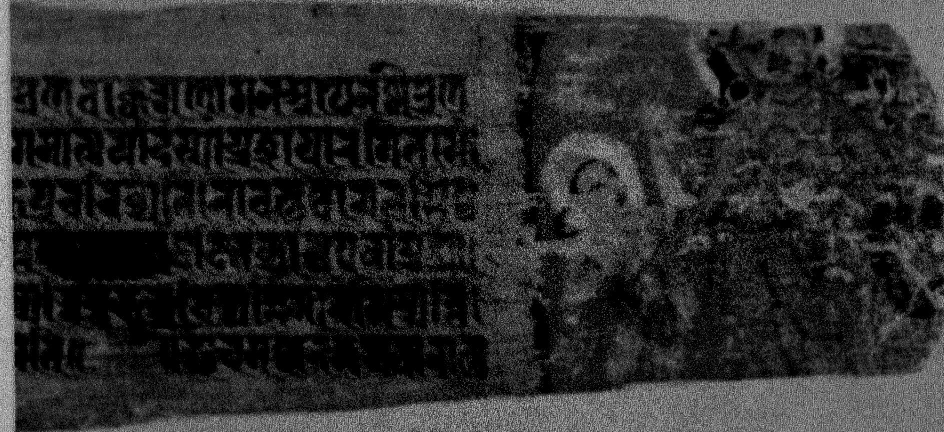
পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এই তারিখটি মহীপালদেবের রাজত্বকালের একেবারে শেষের দিকে ফেলা হয়েছে। মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্ক-যুক্ত চিত্রিত পুঁথি আমাদের তালিকায় কাল হিসাবে প্রাচীনতম।* উল্লিখিত দুখানি পুঁথিই প্রথম মহীপালদেবের সমকালীন হলে পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানিকেই এই পর্যায়ের সর্বপ্রথম নিদর্শন বলে ধরতে হবে। চিত্ররীতি ও অঙ্কনভঙ্গির বিচারে দুখানি পুঁথিই একই রাজার আমলে প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে করা কঠিন।

রেখা ও রঙ-এর ব্যবহারে দুখানি পুঁথির চিত্রে দুটি ভিন্ন আদর্শের ছাপ লক্ষ করা যায়। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই আদর্শ একই কালে বিদ্যমান ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। রেখা ও রঙ-এর সুসমঞ্জস ব্যবহারে মহী-পালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পুঁথির (তালিকার ১ নং) চিত্রগুলি (চিত্র নং ৪ ও ৫) গুপ্ত-কালীন অজন্তা ও বাঘ গুহার চিত্রগুলির সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। সুললিত, সাবলীল, ছেদহীন ও তরঙ্গায়িত রেখা-বিন্যাসে দেহভঙ্গি আর তার নতোন্নত অংশ একসূত্রে গ্রথিত দেখা যায় মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের এই পুঁথির চিত্রে। তেমনই রঙ-এর সুপরিসর ব্যবহারে আছে শ্যামোজ্জ্বলতার প্রতিফলন, ফলে দেহ-সৌষ্ঠব উদ্ভাসিত হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। রেখা ও রঙ-এর মাধ্যমে নতোন্নত-বিভাজন বা বর্তনা-সৃষ্টির এই সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস ভারতীয় চিত্রশিল্পের গুপ্তকালীন মার্গরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত। পরবর্তী কালে রেখা ও রঙ-এর এই প্রসাদ-গুণ ক্রমশঃ হ্রাস পেলেও মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পুঁথির চিত্রে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাবে

*সরজতানন্দ দাশ গুপ্ত তাঁর Eastern Indian Manuscript Painting নামক গ্রন্থে ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে চিত্রিত একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২০)। কোন পত্রপত্রিকায় বা তালিকা গ্রন্থে এরকম কোন পুঁথির উল্লেখ আমরা পাইনি। উক্ত তথ্যের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে R. R. Diwakar সম্পাদিত Bihar through the ages (p. 312); এই পৃষ্ঠায় ধর্মপালদেবের আমলের কোন চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ নাই; উল্লেখ আছে শুধু ধর্মপালদেবের রাজ্যাঙ্কের বোধগয়া শিলালিপির।

দেখা যায়। মহীপালদেবের সপ্তম ও সপ্তবিংশতিতম রাজ্যাঙ্কের পুঁথির (তালিকার ২ ও ৩ নং) চিত্রেও এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতীয়মান।

তুলনায় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথির (তালিকার ৭ নং) চিত্রে দেখা যায় এমন একটি পৃথক চিত্রমানসের প্রকাশ, যার সঙ্গে গুপ্তকালীন মার্গরীতির সংযোগ অতিমাত্রায় ক্ষীণ। এ পুঁথির চিত্র রেখা-প্রধান, রেখা-সর্বস্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ মার্গরীতির রেখা-বিন্যাসের প্রসাদ-গুণ, তার লালিত্য, তার সাবলীলতা বা বর্তনা-সৃষ্টিতে তার অপূর্ব দক্ষতা—এসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের এই পুঁথির চিত্রে (চিত্র নং ১১, ১২, ১৩)। এ পুঁথির চিত্রের রেখা দৃঢ়বদ্ধ, ভঙ্গশীল, ঋজু অথবা কুটিল—অবিচ্ছিন্ন বা তরঙ্গায়িত নয়। রেখা-বিন্যাসের এই খণ্ডিত পদ্ধতিতে চিত্রের সমষ্টিগত ঐক্য ও বর্তনা-গুণ উভয়েরই অভাব সমানভাবে দেখা যায়। রঙ-এর সমান ব্যবহারে শ্যামোজ্জ্বলতার কোন প্রতিফলন নেই এই পুঁথির চিত্রে; ফলে দ্বিমাত্রিক এই চিত্ররীতি মার্গরীতি থেকে পৃথক আদর্শের বলেই স্বীকার করতে হবে। উপরন্তু, এই পুঁথির চিত্রের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। পার্শ্বগত ভঙ্গিতেও দুটি নেত্রেরই সমবিন্যাস এই পুঁথির চিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, ফলে একটি নেত্রের দেহগণ্ডীর বাইরে উদ্গত অতিক্রমণ স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান এই পুঁথির চিত্রে। এই বৈশিষ্ট্য মধ্য-যুগীয় ভারতীয় চিত্রে দেখা যায় কোন কোন অঞ্চলে। কিন্তু কোথাওই এই লক্ষণটির আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষার্ধের আগে দেখা যায় না। সব মিলিয়ে মহীপালদেব-নামাঙ্কিত পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথির চিত্র এমন এক রীতির পরিচায়ক যা মার্গরীতি থেকে পৃথক বলেই স্বীকৃত। শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ (Stella Kramrisch) এই রীতি মধ্য-যুগীয় আদর্শে গড়ে উঠেছিল বলে মনে করেন। তাঁর মতে মার্গরীতিও মধ্য-যুগীয় রীতির সমকালে বিদ্যমানতা অসম্ভব নয়। এই মতানুসারে তিনি এই দুখানি (মহীপাল-নামাঙ্কিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের) পুঁথিই প্রথম মহীপালদেবের আমলে প্রস্তুত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।





মার্গরীতি ও মধ্য-যুগীয় রীতির শিল্পমানসের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী ও স্পষ্ট যে এই দুখানি পুঁথির মধ্যে কালের ব্যবধান স্বীকার করাই সমীচীন হবে। দুটি পুঁথি সমকালের, এক বছরের ব্যবধানে প্রস্তুত হয়েছিল, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃই যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। মহীপাল-নামাঙ্কিত ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পুঁথির চিত্র গুপ্তকালের মার্গরীতির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক-যুক্ত দেখে বলা যায় যে পুঁথিখানি পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথি থেকে অনেক আগের ও প্রথম মহীপালদেবের আমলের। মহীপাল-দেব-নামাঙ্কিত সপ্তম ও সপ্তবিংশতিতম রাজ্যাঙ্কের দুখানি পুঁথি (তালিকার ২ ও ৩ নং) সম্পর্কেও একই সিদ্ধান্ত করা যেতে প্যারে। মহীপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানি (তালিকার ৭ নং) প্রস্তুত হয়েছিল দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ে। এই দুই রাজার মধ্যে কালের ব্যবধান, রাজ্যলাভের বছর থেকে গণনায়, প্রায় একশ বছর।

পরের এক অনুচ্ছেদে মার্গরীতি ও মধ্য-যুগীয় চিত্ররীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মধ্য-যুগীয় রীতির প্রকৃষ্ট রূপ দেখা যায় পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষের ভাগ থেকে।

পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন তিব্বতের নোর (Ngor) বিহারে রক্ষিত পঞ্চরক্ষার একখানি চিত্রিত পুঁথির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পুঁথিখানি (তালিকার ৪ নং) গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজার আমলে প্রস্তুত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় রাজ্য-সম্বৎসরের অঙ্কটি এখন লুপ্ত। এই গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন এই গোবিন্দচন্দ্র ও গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র এক ও অভিন্ন। এই মত গ্রহণ করতে কিছু বাধা আছে। পুঁথিখানির তারিখ-পুষ্পিকায় গোবিন্দ্রচন্দ্রকে 'পরমসৌগত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এই রাজা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দ-চন্দ্রের দুই পত্নীর বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগের কথা আমাদের জানা থাকলেও রাজা নিজে

ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁকে কখনও 'পরমসৌগত' আখ্যা দেওয়া যায় না। গোবিন্দচন্দ্র নামে একজনই বৌদ্ধ রাজার কথা আমরা জানি—তিনি হচ্ছেন চন্দ্র বংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রদেব। পূর্ব বঙ্গ ছিল চন্দ্র রাজাদের অধিকারে আর বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজধানী। গোবিন্দচন্দ্র সহ এই বংশের সব রাজারই 'পরমসৌগত' আখ্যা দেখা যায় তাঁদের লিপিমালায়। এই কারণে এই পুঁথির পুষ্পিকার গোবিন্দচন্দ্র ও পূর্ব বঙ্গের চন্দ্র বংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক ও অভিন্ন এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। সকল প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদে তিনি পূর্ব বঙ্গে রাজত্ব করতেন একথাও আমাদের জানা আছে। গোবিন্দচন্দ্র অন্ততঃ ২৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন তাও আমরা জানি। এই পুঁথির তারিখ-পুষ্পিকার রাজ্য-সম্বৎসরের অঙ্কটি লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে, হয়তো প্রথম মহীপালদেবের রাজত্ব কালের মধ্যেই। গোবিন্দচন্দ্রের অধিকার পূর্ব বঙ্গের বাইরে বিস্তৃত ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং পুঁথিখানি বর্তমান বাংলাদেশেরই কোন স্থানে প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে হয়। খণ্ডিত পুষ্পিকায় 'শ্রী-বিক্রম...' এই পাঠ দেখে অনুমান করা চলে যে পুঁথিখানি লেখা হয়েছিল চন্দ্র বংশের রাজধানী বিক্রমপুরে, সম্ভবতঃ বিক্রমপুর মহাবিহারে। পুষ্পিকার এই অংশে সাধারণতঃ পুঁথি লেখার স্থানের উল্লেখ থাকে। বাঙ্গালীর কাছে এই পুঁথিখানি আর তার চিত্র বিশেষ মূল্যবান। এখন অবশ্য এই চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ নেই বললেই হয়।

প্রথম মহীপালদেবের পুত্র নয়পালদেবের সময়ের দুখানি চিত্র-সংযুক্ত পুঁথি (তালিকার ৫ ও ৬ নং) আমাদের জানা আছে। দুখানিই তাঁর চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের একখানি (তালিকার ৬ নং) প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে। পুঁথি দুখানি একাদশ শতকের চল্লিশের দশকের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। নয়পালদেবের পুত্র



ছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপাল†। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় মহীপালদেব। দ্বিতীয় মহীপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের চিত্রিত পুঁথির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই পুঁথিখানি একাদশ শতকের সত্তরের দশকে প্রস্তুত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

আমাদের তালিকায় সাতখানি পুঁথি আছে রামপালদেবের আমলের—রাজ্যাঙ্ক ২, ৯, ১৫,* ১৮, ৩৬,** ৩৯, আর ৫৩ (তালিকার ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪)। রামপালদেব ছিলেন দ্বিতীয় মহীপালদেবের ছোট ভাই। দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা সকলেরই জানা আছে। সেই বিপ্লবে মহীপালদেব প্রাণ হারান ও বরেন্দ্রী পাল রাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। রামপালদেব বিপ্লবের উত্তরসাধক ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৫৩ বছর রাজত্ব

† Eastern Indian Manuscript Painting নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২০) তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের ষড়বিংশতিতম রাজ্যাঙ্কের একখানি চিত্র-সংযুক্ত পঞ্চরক্ষা পুঁথির উল্লেখ দেখা যায়। পুঁথিখানি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংস্কৃত পুঁথির তালিকা-সূচীতে (৫৪৫ নং, পৃঃ ২৩২-৩৩) উল্লিখিত পুঁথিখানি চিত্র-খচিত বলে পরিচিতি দেওয়া হয়নি। তালিকা-কার এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন আর চিত্র-সংযুক্ত পুঁথির ক্ষেত্রে সে তথ্য তিনি যথারীতি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উক্ত তালিকা-সূচীতে সংশ্লিষ্ট পুঁথি সম্বন্ধে এই তথ্যের অভাব দেখা যায়। বর্তমান লেখকও ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পুঁথিখানিতে কোন চিত্র দেখেননি।

*এই পুঁথিখানি Eastern Indian Manuscript Painting নামক গ্রন্থে রামপালদেবের পঞ্চবিংশ রাজ্যাঙ্কের আর কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ২০)। পুঁথিখানি রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের, আর আছে অক্সফোর্ডের বদ্‌লিয়ন গ্রন্থাগারে (তালিকা দেখুন)।

**উক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ২৯) পুঁথিখানির রাজ্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে ৩৯। লেখক Rūpam (No. 1)-এ প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। পুষ্পিকা-পরীক্ষায় দেখা যায় তারিখটি হবে ৩৬ (তালিকা দেখুন)।

করেন (তালিকার ১৪ নং)। এই রাজার আমলের সাতখানি পুঁথির মধ্যে একখানি (তালিকার ১০ নং) প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে, আর একখানি (তালিকার ১১ নং) আপনক মহাবিহারে। এই রাজার আমলের সাতখানি পুঁথর মধ্যে প্রথম চারখানি লেখা হয়েছিল একাদশ শতকের শেষ পাদে, আর বাকী তিনখানি দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে। বর্মবংশীয় হরিবর্মদেবের আমলের দুখানি পুঁথি (রাজ্যাঙ্ক ৮—তালিকার ১৫ নং, ও রাজ্যাঙ্ক ১৯—তালিকার ১৬ নং) আমরা পেয়েছি। হরিবর্মদেবকে রামপালদেবের সমকালীন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। পুঁথি দুখানিও প্রস্তুত হয়েছিল পূর্ববঙ্গেই। একাদশ শতকের শেষ পাদ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে নয়খানি চিত্র-যুক্ত পুঁথি পাল যুগের চিত্রকলার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের মূল্যবান নিদর্শন।

গোপালদেবের নামাঙ্কিত রাজ্যাঙ্কের দুখানি চিত্রিত পুঁথি (তালিকার ১৭ ও ১৮ নং) আমাদের জানা আছে—একখানি চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের আর একখানি পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের। পাল রাজবংশে গোপাল নামে তিনজন রাজা ছিলেন। এই নামের প্রথম রাজা পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, আর তিনি বর্তমান ছিলেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে। দ্বিতীয় রাজা রাজত্ব করতেন দশম শতকের মধ্যভাগে। গোপাল নামের তৃতীয় রাজা ছিলেন রামপালদেবের পৌত্র; রামপালদেবের পর তিনি পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের শুরুতে। গোপালদেব-নামাঙ্কিত এই দুখানি পুঁথি এ নামের এক রাজার বা দুই রাজার আমলে তৈরী হয়েছিল তারও বিচার করা প্রয়োজন। বোস্টন মিউজিয়মে রক্ষিত চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানি (তালিকার ১৭ নং) তৃতীয় গোপালদেবের আমলের বলে কুমারস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন। চিত্ররীতির বিচারে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলেই মনে হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানি দ্বিতীয় গোপালদেবের আমলের বলে কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। দুখানি পুঁথির চিত্রই এক ও অনুরূপ রীতির সাক্ষ্য দেয়। শুধু তাই নয়, এই পুঁথির চিত্র রীতি-বিচারে দ্বাদশ শতকের অন্যান্য



পংথির চিত্র থেকে অভিন্ন। এই কারণে পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পংথির গোপালদেব ও রামপালদেবের পৌত্র তৃতীয় গোপালদেব এক ও অভিন্ন বলেই স্বীকার করতে হবে।* আগে মনে করা হত তৃতীয় গোপালদেবের রাজত্বকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। আর সেই বিশ্বাস অনুসারে পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পংথিখানি দ্বিতীয় গোপালদেবের আমলের বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন। কিছুদিন আগে গোপালদেব-নামাঙ্কিত চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের একখানি সদাশিব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। অক্ষরের রূপ ও ভাস্কর্যরীতির বিচারে এই মূর্তিকে কোন ক্রমেই দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং এ মূর্তি পণ্ডিতেরা তৃতীয় গোপালদেবের সমকালীন বলেই মত প্রকাশ করেছেন। শিল্পরীতির বিচার ও বিশ্লেষণে এই মূর্তি আর পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পংথিখানি তৃতীয় গোপালদেবের আমলের বলে সঙ্গত ভাবেই সিদ্ধান্ত করা চলে। পাল সম্রাটদের কালপঞ্জীতে তৃতীয় গোপালদেবের পনের বছরের রাজত্বকাল অসম্ভব নয়।

তৃতীয় গোপালদেবের পর তাঁর খুল্লতাত মদনপালদেব পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমাদের তালিকার একখানি পংথির তারিখ দেখা যায় 'শ্রী-মদনপালস্য রাজসম্বৎ ১৭' (তালিকার ১৯ নং)। মদনপালদেবের রাজ্যলাভের তারিখ আমাদের জানা আছে। এ সম্পর্কে আমরা সঠিক প্রমাণ পাই তাঁর বালগুদার লিপিতে। এই লিপির তারিখ শকাব্দ ১০৮৩ (খ্রীষ্টীয় ১১৬১-৬২) ও মদনপালদেবের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্ক এক ও সমার্থক। এই গণনানুসারে মদনপাল রাজ্যলাভ করেন ১১৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং আমাদের পংথিখানির তারিখ ১১৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

---

*গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পংথিখানির উল্লেখে Eastern Indian Manuscript Painting গ্রন্থের লেখকের বিশেষ প্রমাদ দেখা যায়। কখনও তিনি এখানি দ্বিতীয় গোপালদেবের আমলের বলে পরিচয় দিয়েছেন (পৃঃ ২০, ৪৫), কখনও বলেছেন এখানি তৃতীয় গোপালদেবের সময়ের (পৃঃ ৩০)।

চারখানি চিত্র-সংযুক্ত পুঁথিতে (তালিকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং) আমরা তারিখ পাই গোবিন্দপাল নামে এক রাজার। দ্বাদশ শতকের পূর্ব-ভারতের ইতিহাসে গোবিন্দপাল একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর নামাঙ্কিত তারিখ-যুক্ত লিপি ও পুঁথি বেশ কিছু পাওয়া গেছে। কয়েকখানিতে তারিখের পূর্বে 'অতীত', 'হত', 'গত', 'বিনষ্ট', প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। একখানি লিপিতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তারিখ পাওয়া যায় 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৪'। সে কারণে অনেকে মনে করেছেন গোবিন্দপাল মাত্র চার বছর পূর্ণগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন, তার পর শুরু হয় তাঁর অতীত-সম্বৎসরের গণনা। গোবিন্দপাল যে চার বছরেরও বেশী সসম্মানে রাজত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই আমাদের তালিকার ২১ নং পুঁথির পুষ্পিকায়। পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল গোবিন্দপালের নবম রাজ্যাঙ্কে—আর পুষ্পিকায় গোবিন্দপালের নামের সঙ্গে 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিকাজ', 'বিজয়রাজ্যে' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহারে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে গোবিন্দপাল অন্ততঃ নয় বছর গৌরবের সঙ্গে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষ করা প্রয়োজন, গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত ১৪, ১৮, ২২, ৩২, ৩৮ সম্বতের ক্ষেত্রে যেমন 'গত', 'অতীত', 'হত', 'বিনষ্ট', প্রভৃতি বিশেষণ দেখা যায়, তেমন আবার ১৮, ২৪, ৩৭, ৩৯ সম্বতের উল্লেখে এ ধরণের বিশেষণের প্রয়োগ নাই। আমাদের তালিকার ২২ নং পুঁথির খণ্ডিত পুষ্পিকায় গোবিন্দপালের ১৮ সম্বৎসরের সঙ্গে 'শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালস্যাভি(-বর্ধমান)' এই বাক্যটি যুক্ত দেখা যায়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একখানি চিত্রবিহীন পুঁথিতে আমরা তারিখ পাই 'শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালীয় সম্বৎ ১৪'। একখানি লিপিতে আবার এই তারিখটি 'অতীত-সম্বৎসর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণাদির সাক্ষ্যে মনে হয় গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত সম্বৎটি, বর্তমানই হোক বা অতীতই হোক, তাঁর রাজ্যলাভের বছর হতেই গণনা শুরু হয়েছিল। গয়ার একখানি লিপিতে গোবিন্দ-



পাল-নামাঙ্কিত তারিখের সঙ্গে সমকালজ্ঞাপক বিক্রমাব্দের তারিখ ব্যবহারে জানা যায় গোবিন্দপাল-সম্বতের শুরু হয় ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই তারিখটি গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভের বৎসর হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। মদনপালের শেষ তারিখ যা আমাদের জানা আছে সেটিও ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ। মদনপালের পর গোবিন্দপাল পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এ মতও পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত চারখানি পুঁথিতে (তালিকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং) তারিখ আছে যথাক্রমে ৯ (১১৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৮ (১১৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ), ২২ (১১৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) আর ৩২ (১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি চিত্রিত পুঁথিরও উল্লেখ প্রয়োজন। এখানিতে (তালিকার ২০ নং) তারিখ আছে 'লক্ষ্মণসেন-গতসম্বৎ ৪'। লক্ষ্মণসেন-নামাঙ্কিত এই সম্বৎটি বহুকাল প্রচলিত ছিল। মিথিলা অঞ্চলে এটির চলন ছিল কয়েকশত বৎসর। এই সম্বতের তারিখের সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত অব্দের তারিখও ব্যবহার হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। সমকালজ্ঞাপক তথ্যাদির প্রমাণে দেখা যায় লক্ষ্মণসেন-সম্বতের প্রারম্ভ তারিখ দ্বাদশ শতকের প্রথম দশক থেকে চতুর্থ দশকের মধ্যে বিভিন্ন বছর থেকে গণনা করা হয়েছে। এ সমস্যার নিরসন এখনও সম্ভব হয়নি। লক্ষ্মণসেন-সম্বতের শুরু যখনই হোক সংশ্লিষ্ট এই পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধেই।

গোমীন্দ্রপাল নামে এক রাজার চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের একখানি চিত্রসংযুক্ত পুঁথি (তালিকার ২৫ নং) আমরা পেয়েছি। এই গোমীন্দ্রপাল কে ছিলেন আমাদের সঠিকভাবে জানা নাই। নাম দেখে মনে হয় পালরাজবংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। পালরাজবংশের আসন্ন পতনের মুখে বর্তমান বিহারের কোন অঞ্চল তাঁর শাসনভুক্ত ছিল এ অনুমানও অসঙ্গত নয়। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল বলা যায়। চিত্ররীতির বিচারেও এ সিদ্ধান্ত

অসমীচীন নয়।

আমাদের জানা তিনখানি চিত্রসংযুক্ত পুঁথিতে (তালিকার ২৬, ২৭ ও ২৮ নং) আমরা সঠিক তারিখ পাই—১২১১ শকাব্দ (১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দ), ১৫০৩ বিক্রমাব্দ (১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) আর ১৫১২ বিক্রমাব্দ (১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। পূর্ব-ভারতে মুসলমান-শাসন পত্তনের পরবর্তী এই তিনখানি চিত্রিত পুঁথি পাল সাম্রাজ্যের অবসানের দীর্ঘকাল পরেও এই চিত্ররীতির অস্তিত্বের পরিচয় দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় এই চিত্ররীতির নিদর্শন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগ হতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। পঁচিশখানি চিত্র-সংযুক্ত পুঁথি দশম শতকের শেষভাগ হতে দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত দুইশত বৎসরের মধ্যবর্তীকালের। এই দুইশত বৎসরই এই চিত্ররীতির পরিপূর্ণ বিকাশের যুগ বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। মুসলমান-অধিকার স্থাপনের পরবর্তী নিদর্শনের সংখ্যাল্পতা দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠায় এই দীর্ঘস্থায়ী চিত্ররীতির অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে, আর রীতিটিও ক্রমাবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। শেষোক্ত তিনখানি পুঁথির চিত্রে সেই সাক্ষ্য স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

। ৩ ।

আগেই বলা হয়েছে খণ্ডিত অবস্থার দরুন কিছু কিছু চিত্রিত পুঁথির তারিখ এখন লুপ্ত। তারিখ-যুক্ত চিত্র-সংযুক্ত পুঁথির তুলনায় এ সব পুঁথির কালনির্ণয় সম্ভব। কম করে চোদ্দখানি তারিখ-বিহীন চিত্রিত পুঁথির কথা আমাদের জানা আছে। তাদের তালিকা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়।



(খ) তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি

১। অপরিমিতায়ুর্নাম মহাযান-সূত্র—আঃ একাদশ শতক। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। তিন পত্রে তিনখানি রেখাচিত্র।

Asiatic Society, Calcutta, No. G. 4716 (Sastri, *op. cit.*, p. 40).

২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হিগ্‌সের সংগ্রহ, বর্তমানে ডেট্রয়েট ইন্‌স্টিটিউট অব আর্টস। বিক্ষিপ্ত পত্রে কতিপয় চিত্র। পাটার চিত্র পরবর্তীকালের। (Sherman E. Lee, *Bulletin, Detroit Institute* of Arts, IX, No. 8) । শার্মান লির মতে পুঁথিখানি দ্বাদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্য-বর্তীকালের। Stooke এ পুঁথিখানিকে রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথির (ক তালিকার ১০ নং) সমকালীন বলে মনে করেন (*OA.*, I, No. 4. p. 40)। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর মতে (*Rupam*, No. 38-39) এই পুঁথিখানির চিত্র একাদশ-দ্বাদশ শতকের অন্যান্য পুঁথির চিত্রের তুলনায় নিম্নমানের তো নয়ই, বরং অজিত ঘোষ সংগ্রহের পুঁথির (নীচের ৩ নং) চিত্র হতে অনেক উন্নতমানের।

৩। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—আঃ দ্বাদশ শতক। কলকাতার অজিত ঘোষের সংগ্রহ, বর্তমানে ওয়াশিংটনের ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট। বিক্ষিপ্ত পত্রে কয়েকখানি চিত্র।

Freer Gallery of Art, Washington, No. 86-58 (*Rupam*, No. 38-39, pp. 70-84).

অজিত ঘোষের মতে পুঁথিখানি নবম শতকের—চিত্র-রীতির বিচারে এ মত সমর্থন করা যায় না। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য অক্ষরের রূপ পরীক্ষা করে পুঁথিখানিকে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের সমকালীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। চিত্ররীতির

বিচারে পুঁথিখানি দ্বাদশ শতকের শেষভাগে প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।*

৪। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অব আর্ট। বিক্ষিপ্ত চিত্র।

৫। তন্ত্রগ্রন্থ—আঃ দ্বাদশ শতক। রাজশাহী (বাংলাদেশ) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা। বহু-হস্ত বহু-পদ বিশিষ্ট দেবতাদের চিত্র-সংযুক্ত।

৬। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউইয়র্কের নার্সালি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। বিক্ষিপ্ত চিত্র।

(*Arts of India and Nepal,* p. 106).

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউইয়র্কের নার্সালি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। বিক্ষিপ্ত চিত্র।

(*Arts of India and Nepal,* p. 106).

৮। ধর্মগ্রন্থের খণ্ডিত পত্র—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউ ইয়র্কের নার্সালি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত।

(*Arts of India and Nepal,* p. 106).

---

*পুঁথিখানি বিক্রমশীলা বিহারে প্রস্তুত হয়েছিল *Eastern Indian Manuscript Painting*- এ (পৃঃ ৪৫) প্রদত্ত এ তথ্য সঠিক নয়।



৯। চিত্রিত পাটা—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরা-মাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত।

(*Arts of India and Nepal*, p. 108).

১০। চিত্রিত পাটা—আঃ দ্বাদশ শতক। নিউইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরা-মাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত।

(*Arts of India and Nepal*, p. 108).

১১। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ—আঃ দ্বাদশ শতক। জাপানের এস্‌ সোয়ামুরার সংগ্রহ। বিক্ষিপ্ত চিত্র।

(Coomaraswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, p. 146).

১২। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের খণ্ডিত পত্র—আঃ দ্বাদশ শতক। জাতীয় সংগ্রহশালা, নূতন দিল্লী।

১৩। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত পত্র—আঃ দ্বাদশ শতক। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলা ভবনে রক্ষিত।

১৪। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের কয়েকখানি খণ্ডিত পত্র—আঃ দ্বাদশ শতক। বোম্বাই-এর হরিদাস সোয়ালীর সংগ্রহ।

(*Nepalese Painting*, Tata Sons Private Limited, Pls. 5, 6. 7).

নেপালী চিত্রকলা সম্পর্কীয় পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় সংশ্লিষ্ট পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল পূর্ব-ভারতে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত—আঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের একখানি বহুলচিত্রিত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে।

। ৪ ।

নেপালী চিত্রকর্মে পূর্ব-ভারতীয় রীতি অনুসৃত হয়েছিল তারনাথের এই মন্তব্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এই সময়ে পূর্ব-ভারতের সঙ্গে নেপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের সমত্ব এই দুই অঞ্চলকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। সমকালীন তারিখ-যুক্ত ও তারিখ-বিহীন নেপালী চিত্রিত পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। পূর্ব-ভারতীয় বা পাল যুগের চিত্ররীতির অনুশীলনে তুলনীয় উপাদান হিসেবে সমকালীন নেপালী চিত্রিত পুঁথির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। নেপালী পুঁথিতে রাজার নামের উল্লেখের সঙ্গে তারিখ দেওয়া আছে এমন এক সম্বতে যার প্রারম্ভ-বর্ষ আমাদের নিশ্চিতরূপে জানা আছে। সম্বৎটি নেপাল-সম্বৎ, নেপাল-অব্দ বা নেওয়ারী-সম্বৎ নামে পরিচিত। গণনা শুরু হয় ৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। নেপালী পুঁথির তারিখ সে কারণে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায়—যেটা পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। নেপালী পুঁথিচিত্র পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির প্রসারই শুধু সূচিত করে না, পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির কাল সম্পর্কে সন্দেহ নিরসনেও সহায়তা করে। নেপালী পুঁথি লেখা হয়েছিল নেওয়ারী অক্ষরে। এই নেওয়ারী লিপি সমকালীন পূর্ব-ভারতীয় লিপির, বিশেষ করে আদি বাংলা লিপির, সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শুরু থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অন্ততঃ আঠারোখানি তারিখ-যুক্ত নেপালী চিত্রিত পুঁথির কথা আমাদের জানা আছে। তাদের তালিকা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চতুর্দশ হতে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তীকালের তারিখসহ চিত্রিত পুঁথির সংখ্যাও অল্প নয়।



আবার তারিখ-বিহীন সমকালীন নেপালী চিত্রিত পুঁথিও বেশ কিছু বিদ্যমান আছে। পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির অনুশীলনে তুলনীয় নেপালী চিত্রসম্ভারও কম নয়।

(গ) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি (বাহুল্য ভয়ে পুষ্পিকার উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নি)।

১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ১৩৫ (খৃষ্টাব্দ ১০১৫)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। পাটার চিত্র সহ ৮৫ খানি চিত্র, তন্মধ্যে ৭৭ খানি পরিচয়-যুক্ত।

Cambridge University Library, No. Add. 1643 (Bendall, *op. cit.*, p. 151; Foucher, *Etude sur l'Iconographie Bouddhique de l'Inde,* I. Cat. I).

২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ১৪৮ (খৃষ্টাব্দ ১০২৮)। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতা। দুখানি চিত্রিত পাটা।

(*Lalitkala, No.* 6, pp. 53-63).

৩। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কয়েকখানি গ্রন্থ—নেপাল-সম্বৎ ১৫৬ (খৃষ্টাব্দ ১০৩৬)। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। পরবর্তীকালের দুখানি চিত্রিত পাটা।

Asiatic Society, Calcutta, No. G. 4077 (Sastri, *Cat.*, V, pp. 718-721).

৪। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ১৭৪ (খৃষ্টাব্দ ১০৫৪)। নিউইয়র্কের নাসলি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্ এঞ্জেলেস কাউন্টি

মিউজিয়মে রক্ষিত। চিত্রিত পাটা।

(*Arts of India and Nepal,* p. 108; Kramrisch, *Art of Nepal,* pl. 75).

৫। পঞ্চরক্ষা—নেপাল-সম্বৎ ১৭৯ (খ্রীষ্টাব্দ ১০৫৯)। জাতীয় সংগ্রহশালা, নূতন দিল্লী। চারখানি চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

National Museum New Delhi, No. 48.33.

৬। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ১৯১ (খ্রীষ্টাব্দ ১০৭১)। কলকাতার এশিয়াটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৩৭ খানি চিত্র—কয়েকখানি বাদে সব পরিচয়-যুক্ত। চিত্রিত পাটা পরবর্তীকালের। * ফ্যুসে-র গ্রন্থে ৩৭ খানি চিত্রের তালিকা আছে—বর্তমানে ২ খানি চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।

Asiatic Society, Calcutta, No. A. 15 (R. L. Mitra, *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,* pp. 185-92; Foucher, *op. cit.,* I, Cat. II).

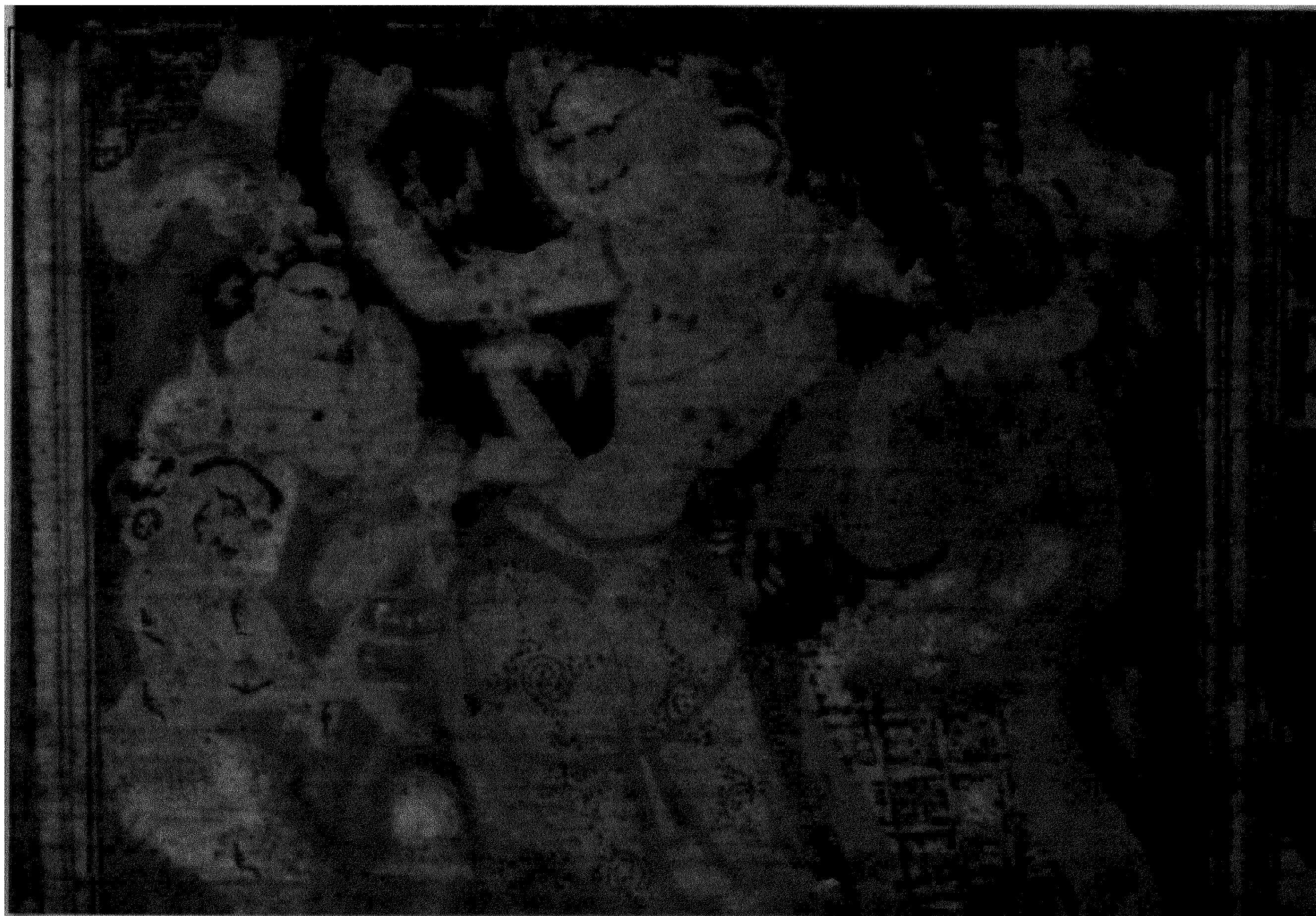
৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ১০৭৩)। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতা। দুখানি চিত্র, পরিচয়সহ।

৮। পঞ্চরক্ষা—নেপাল-সম্বৎ ২২৫ (খ্রীষ্টাব্দ ১১০৫)। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা। ১০ খানি চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

Asutosh Museum, No. T. 1055 (*JISOA,* XV, pp. 98f).

---

*পুষ্পিকা থেকে জানা যায় পুঁথিখানি নেপালে প্রস্তুত হয়েছিল। *Eastern Indian Manuscript Painting* (p. 45)-গ্রন্থে এখানিকে 'most important Pala manuscript from Bihar' বলা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় আবার এখানিকে বাংলাদেশের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



৯। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ২৩০ (খ্রীষ্টাব্দ ১১১০)। ক্লিভল্যাণ্ড মিউজিয়ম অব আর্ট। বিক্ষিপ্ত চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

Cleveland Museum of Art, No. 38.301 (*Handbook*, p. 233).

১০। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—ইন্দ্রদেবের রাজত্বকাল (ইন্দ্রদেব নেপাল-সম্বৎ ২৭৪ (খ্রীষ্টাব্দ ১১২৭) থেকে নেপাল-সম্বৎ ২৫৫ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৩৫) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন)। নেপালস্থ পাটনের জ্ঞানবজ্র বজ্রাচার্যের ব্যক্তিগত উপাসনাগৃহ। কয়েকখানি চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

(Hemraj Sakya, *Mediaeval Nepal*, pp. 9-10).

১১। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ২৬৪ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৪)। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, কলকাতা। ২ পত্রে ২ খানি চিত্র।

১২। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ২৬৮ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৮)। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৪ পত্রে ৪ খানি চিত্র।

Asiatic Society, Calcutta, No. G. 4203 (Sastri, *Cat.* I, p. 3).

১৩। পিঙ্গল-মত—নেপাল-সম্বৎ ২৯৪ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৭৪)। নেপালস্থ কাঠমাণ্ডুর বীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের চিত্রিত পাটা।

(*JISOA.*, V, pp. 1f.).

১৪। ভোজদেব-সংগ্রহ—নেপাল-সম্বৎ ৩০৯ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৮৯)। জাতীয় সংগ্রহশালা, নূতন দিল্লী। ৬ খানি চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

(*Manuscripts from Indian Collections*, p. 9).

১৫। কারণ্ডব্যূহ—নেপাল-সম্বৎ ৩১৬ (খ্রীষ্টাব্দ ১১৯৬)। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম। চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

British Museum, London, No. Or. 3345 (Bendall, *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the British Museum*, Entry No. 542, pp. 230-31).

১৬। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ৩৫৪ (খ্রীষ্টাব্দ ১২৩৪)। নিউইয়র্কের নার্সলি ও এলিস হীরামাণিকের সংগ্রহ—বর্তমানে লস্‌ এঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়মে রক্ষিত। ১৪ খানি চিত্রিত পত্র।

(*Arts of India and Nepal*, pp. 106-08).

১৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—নেপাল-সম্বৎ ৩৬৭ (খ্রীষ্টাব্দ ১২৪৭)। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত। ২ পত্রে ৪ খানি চিত্র।

British Museum, London, No. Or. 2203 (Bendall, *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the British Museum*, Entry No. 536, pp. 226-27).

১৮। পঞ্চরক্ষা—নেপাল-সম্বৎ ৩৮৫ (খ্রীষ্টাব্দ ১২৬৫)। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ৬ পত্রে ৬ খানি চিত্র ও চিত্রিত পাটা।

Asiatic Society, Calcutta, No. B. 35.

তারিখ-বিহীন কয়েকখানি পূর্ব-ভারতীয় ও নেপালী চিত্রিত পুঁথির বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক তাদের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ চিত্রের দরুন। আনুমানিক একাদশ শতকের একখানি পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি (খ তালিকার ১ নং) এখন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই পুঁথিতে কয়েকখানি রেখাচিত্র (চিত্র নং ৪৮, ৪৯, ৫০) দেখা যায়। সেকালে চিত্রকর্মে প্রাথমিক রেখাঙ্কনের বিধি ও প্রক্রিয়া কেমন ছিল তা আমরা জানতে পারি এই পুঁথির রেখাচিত্রের মাধ্যমে। প্রচুর চিত্র-সংবলিত একখানি



নেপালী পুঁথির সন্ধান আমরা পেয়েছি—পুঁথির পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সংরক্ষিত আছে আমেরিকার তিনটি সংগ্রহে : Cleveland Museum of Art, Seattle Art Museum ও Nasli and Alice Heeramaneck Collection)। পুঁথিখানি আনুমানিক দ্বাদশ শতকের। গ্রন্থের বিষয়বস্তু সুধনকুমারের কাহিনী—আর এই কাহিনীর চিত্রণে শিল্পী প্রচলিত ধারার মধ্যে কিছু নূতনত্বের আভাস দিয়েছেন যার ইঙ্গিত ধর্মাশ্রয়ী এই রীতির অধিকাংশ নিদর্শনেই মেলে না। নূতন দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালার একখানি নেপালী পুঁথির পাটায় চিত্রিত আছে জাতকের একটি কাহিনী—এ কাহিনীর বিন্যাস ও চিত্রণেও অনুরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই পাটার তারিখ হবে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক। Svetoslav Roerich -এর সংগ্রহের একখানি বহুল-চিত্রিত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিও এই পর্যায়ভুক্ত দেখা যায়। চিত্ররীতির বিচারে পুঁথিখানি আনুমানিক একাদশ শতকের বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সব পুঁথির চিত্রে প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হয়নি সত্য, কিন্তু রচনার সুপরিসরতায়, অঙ্কন-ভঙ্গির দৃঢ়তায় আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এক নূতন দৃষ্টির, হয়তো এক নূতন ধারার, সঙ্কেত মেলে এই কয়খানি পুঁথি আর পাটার চিত্রে। ধর্মাশ্রয়ী রীতির বাধ্যবাধকতা এ ধারায় অল্পাংশেই স্বীকৃতি পেয়েছে—ফলে চিত্রাঙ্কন হয়েছে অনেক স্বচ্ছ।

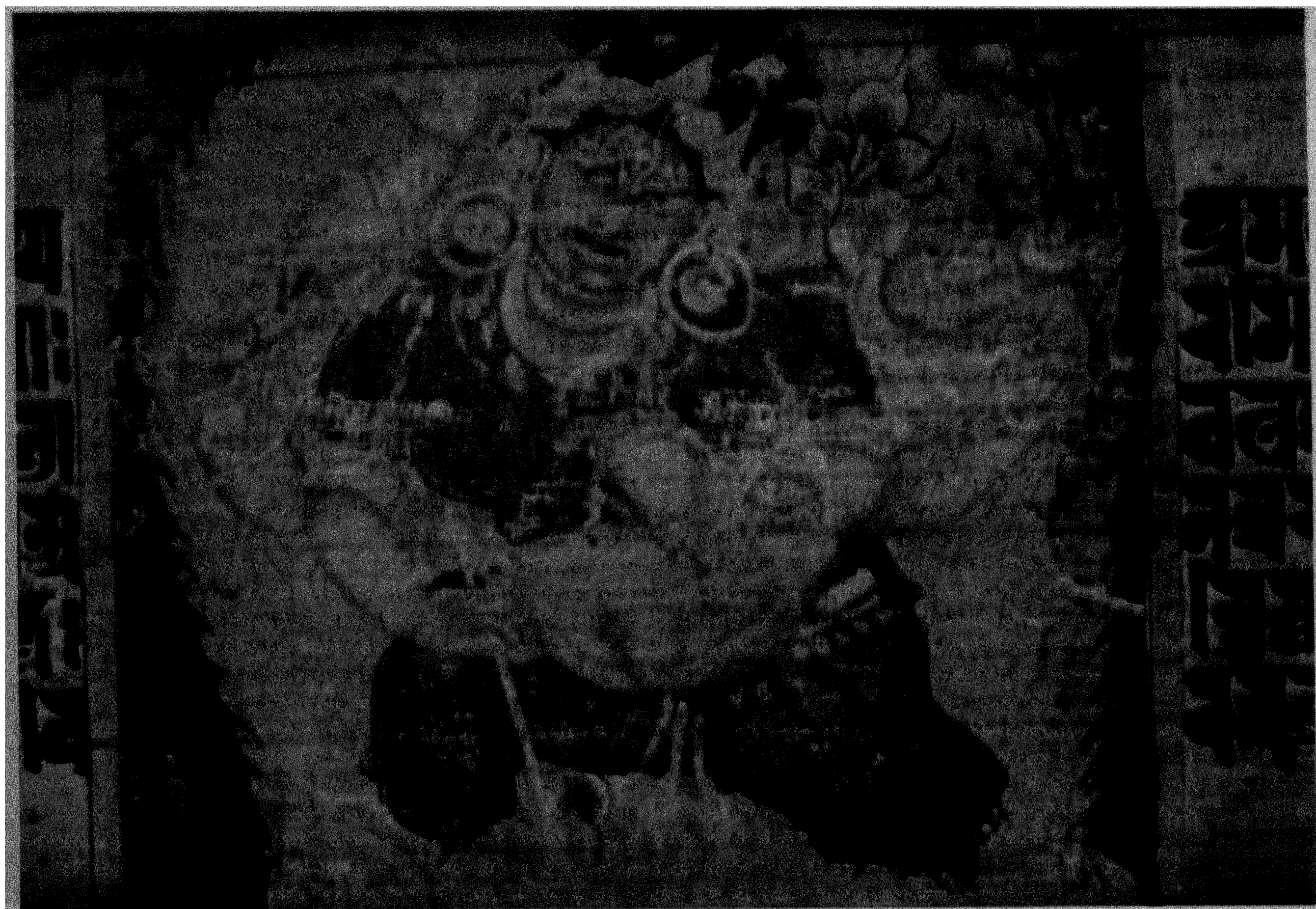
তিনখানি তারিখ-যুক্ত নেপালী পুঁথির (গ তালিকার ১, ৬ ও ৭ নং) উল্লেখও আবশ্যক আর এক বৈশিষ্ট্যের দরুন। এই তিনখানিতে চিত্রের সঙ্গে চিত্রের পরিচয় দেওয়া আছে। সে কারণে এই তিনখানি পুঁথির চিত্র বিশেষ মূল্যবান। বৌদ্ধ প্রতিমাতত্ত্বের অনুশীলনে এই পরিচয়-লিপির বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে—Foucher তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বহুকাল আগে। বর্তমান লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে।* একখানি পুঁথিতে (গ তালিকার ১ নং) তখনকার দিনের অনেক

*S. K. Saraswati, *Tantrayana Art : An Album*, Calcutta, 1977.

বৌদ্ধ ধর্মস্থান ও মন্দিরের পরিচয়-যুক্ত চিত্র দেখা যায়। এই সব চিত্রের অবলম্বনে ভারতীয়, বিশেষতঃ পূর্ব-ভারতীয়, স্থাপত্য-শিল্পের কয়েকটি লুপ্ত ধারার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থাপত্য-কলার সঙ্গে এই লুপ্ত ধারার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লেখক করেছেন আর একখানি গ্রন্থে।*

অধুনা বিদ্যমান নেপালী চিত্রিত পুঁথির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন (গ তালিকার ১ নং) অনুরূপ পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি নেপালে প্রসারিত হয়েছিল সন্দেহ নাই। পূর্ব-ভারতে এই রীতির ক্ষয় শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতকের অন্তে, মুসলমান অধিকার পত্তনের যুগ হতে। নেপালে অবশ্য এই রীতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল তারপরও বহুকাল ধরে, যদিও পূর্ব-ভারতীয় উৎস শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেপালেও স্বাভাবিক অবনতির সূত্রপাত দেখা যায়।

*S. K. Saraswati, *Architecture of Bengal,* Book I, Calcutta 1976.



॥ তিন ॥

আঙ্গিক-কথা

পাল যুগের চিত্রকলার অনুশীলনে পুঁথি-প্রস্তুতি-বিধি ও অঙ্কন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে ও নেপালে পুঁথি লেখা হত তালজাতীয় গাছের পাতায়। অবশ্য দু-একটি অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাগজ ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরবর্তী কালে। আমাদের জানা চিত্রিত পুঁথির একটি ছাড়া সব ক'খানিই লেখা হয়েছে তালপত্রে।

তালজাতীয় গাছের পাতা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী আর ভঙ্গুর। পুঁথি-প্রস্তুতির এত পরেও যে এতসংখ্যক নিদর্শন বিদ্যমান আছে সেটা খুব বিস্ময়কর বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই, ভঙ্গুর পাতাগুলিকে রক্ষা ও দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য এমন কোন পদ্ধতি সে-কালে প্রয়োগ করা হয়েছিল যার ফলে পুঁথিগুলি এতকাল ধরে টিকে আছে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থাতেই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুঁথির জীর্ণতার পরিমাণ তুলনায় অনেক বেশী। হয়তো পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়া নষ্ট ও লুপ্ত হওয়ার দরুন সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি পরবর্তী কালের পুঁথিতে। এই সংরক্ষণ পদ্ধতি যে সে-কালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাচীন পুঁথি পরীক্ষায় দেখা যায়, পুঁথি লেখার কাজে দুই শ্রেণীর তাল-পত্রের ব্যবহার হয়েছে। 'তাল' শব্দ সংস্কৃত। আঞ্চলিক ভাষায় তার রূপান্তর

হয়েছে 'তাল' ও 'তাড়'। এই দুই শ্রেণীর তালপাতা 'খড় তাড়' ও 'শ্রী তাড়' নামেও পরিচিত। বঙ্গদেশ সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই দুই শ্রেণীর পাতা যথাক্রমে 'তাল' ও 'তেরেট' নামে অভিহিত। প্রথম শ্রেণীর পাতা ঈষৎ স্থূল (পুরু), দৈর্ঘও তার কম। এগুলি সহজেই ভঙ্গুর ও পচনশীল হওয়ার দরুন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমাদের পুঁথিতে এই শ্রেণীর তালপাতার ব্যবহার হয়েছে খুব কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম (পাতলা) ধরণের, কতকাংশে সম্প্রসারণশীলও বটে, আর স্বতঃই নমনীয়। এই সব কারণে এই শ্রেণীর পাতার স্থায়িত্ব অনেক বেশী। এই ধরনের পাতার দৈর্ঘ অনেক সময় ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। অবশ্য দুই শ্রেণীর পাতাই প্রস্থে অনেক কম, সাধারণত ৭½ সেন্টিমিটারের বেশী নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাতাই পুঁথি লেখার কাজে প্রাচীনকালে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়, সম্ভবত তার স্থায়িত্ব গুণের দরুন। তা ছাড়াও প্রস্তুতি-পর্বেই বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতার স্থায়িত্ব বর্ধন করা হত। এ প্রক্রিয়া যে কার্যকরী ছিল তা জানা যায় এত সংখ্যক প্রাচীন পুঁথির অস্তিত্বে।

লেখার জন্য তালপাতা প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া ছিল অতি সহজ ও সাধারণ ধরনের। পাতাগুলি সংগ্রহ করে গোছা করে বাঁধার পর জলে ডুবিয়ে রাখা হত। মাসখানেক পর সেগুলি তুলে গোছা বাঁধা অবস্থাতেই লম্বাভাবে ঝুলিয়ে রাখা হত জল ঝরানোর জন্য। জল ঝরে গেলে পাতাগুলো আলাদাভাবে ছায়ায় শুকানো হত। আবহাওয়া অনুসারে পাতাগুলো শুকাতে লাগতো চার থেকে সাত দিন। তারপর প্রত্যেকটা পাতা শাঁখ দিয়ে ঘষে দু দিক মসৃণ করা হত। পরে পাতাগুলো সাজিয়ে সমানভাবে কাটা হত। এইভাবে পুঁথি-প্রস্তুতির প্রারম্ভিক পর্বের হত সমাপ্তি।

পুঁথি লেখা ও চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও কুশলী লিপিকর ও চিত্রকর নিয়োগই ছিল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। সব ক্ষেত্রেই লেখার পংক্তি সাজানো হত দৈর্ঘের সমান্তরালে। প্রত্যেকটি



পাতায় থাকত পাঁচ থেকে সাত পংক্তি (চিত্র নং ১, ২, ৪৬, ৪৭)। চিত্রবিহীন পুঁথিতে এই পংক্তি হত অবিচ্ছিন্ন, পুঁথি বাঁধবার ছিদ্রের ক্ষেত্র বাদে। চিত্রসংযুক্ত পুঁথিতে লেখা বিভক্ত থাকত কয়েকটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে চিত্রের দ্বারা। পুঁথি লেখবার সময় লিপিকর স্বভাবতঃ শূন্য ক্ষেত্র রেখে দিতেন। পুঁথি লেখার শেষে চিত্রকর তা পূরণ করতেন চিত্রের মাধ্যমে। এইভাবে লিপিকর ও চিত্রকর আপন আপন কৃতির দ্বারা পুঁথি সম্পূর্ণ করেছেন।

সে কালে পুঁথি লেখা যে বেশ আয়াসসাধ্য ছিল সে কথা লিপিকরেরা অনেক সময় উল্লেখ করেছেন একটি বহু প্রচলিত শ্লোকের মাধ্যমে ঃ

ভগ্নপৃষ্ঠং কটিগ্রীবং বদ্ধমুষ্টিরধোমুখম্।
কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থং যত্নেন পরিপালয়েৎ ॥

পুঁথির পাতাগুলি প্রস্থের অনুপাতে অনেক বেশী দীর্ঘ। পাতাগুলির দুপাশে রাখা হত দুটি ছিদ্র। প্রত্যেক গ্রন্থের পাতাগুলি সাজিয়ে ছিদ্রের মধ্যে সুতো পরিয়ে কাঠের পাটার সমকেন্দ্রে ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আবার গলিয়ে শক্ত ভাবে পুঁথি বাঁধা হত। 'রক্ষেৎ শিথিল বন্ধনাৎ' এই অনুজ্ঞা অনেক পুঁথিতে লিপিকরদের বচনে দেখা যায়।

প্রতিটি চিত্রিত পত্রে সাধারণত তিনখানি চিত্রিত ফলক দেখা যায়—একটি কেন্দ্রস্থলে আর দুটি দুই পাশে (চিত্র নং ১, ৪৬, ৪৭)। কোন কোন পত্রে মাত্র একটি চিত্র আছে পাতার মধ্যস্থলে, আবার কয়েকটাতে শুধু দুটি চিত্র দেখা যায়, পাতার দু-পাশে। চিত্রফলকগুলির মাপ সাধারণত ৬×৭ সেন্টিমিটার। কিছু পরবর্তীকালের পুঁথিতে ছিদ্রের ক্ষেত্রেও চিত্রাঙ্কন (চিত্র নং ২) দেখা যায়। কোন কোন পুঁথিতে আবার অধ্যায় সমাপ্তি সূচিত করা হয়েছে অলংকৃত নক্শা দিয়ে। চিত্রিত পুঁথির পাটার অভ্যন্তর ভাগ, আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বহির্ভাগও চিত্রমণ্ডিত করা হত। মনে

রাখা প্রয়োজন ধর্মগ্রন্থের এই পুঁথিগুলির নিয়মিত পুজো হত, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুজানুষ্ঠানে ঘি চন্দন সিঁদুরাদির প্রলেপে বহির্ভাগের চিত্র এখন লুপ্ত। পাটার অভ্যন্তর-ভাগের চিত্র অনেক পুঁথিতেই (চিত্র নং ৩) মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আছে। পাটার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন দেখা যায়; পাতার চিত্রের মত ছেদ না থাকায় রচনা ভঙ্গী অনেক সুপরিসর। কোন কোন পাটার চিত্র পরবর্তী কালের দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে প্রয়োজন হলে পুরনো পাটার বদলে নতুন পাটার ব্যবস্থা করা হত।

তারিখ-পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে পূর্ব-ভারতের তিনখানি পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে (ক তালিকার ১, ৬ ও ১০ নং), একটি বিক্রমশীলদেব বিহারে (ক তালিকার ১৮ নং), আর একটি আপনক মহাবিহারে (ক তালিকার ১১ নং)। গোবিন্দচন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত পুঁথিটি (ক তালিকার ৪ নং) বিক্রমপুর মহাবিহারে প্রস্তুত হয়েছিল আমাদের এ অনুমানও হয়তো অসঙ্গত নয়। নেপালী পুঁথির পুষ্পিকা থেকেও আমরা সন্ধান পাই যে কিছু-সংখ্যক পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল নেপালস্থ বিভিন্ন বিহারে। এ সব তথ্য থেকে স্বতই সিদ্ধান্ত করা চলে যে তখনকার দিনে ভিক্ষুসংঘ-অধ্যুষিত এই সব বিহারে লিপি ও চিত্রকর্মের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। আর সে ব্যবস্থায় কুশলী ও নিপুণ লিপিকর ও চিত্রকর নিয়োগ করার কোন অসুবিধা হত না।

আমাদের জানা পুঁথিগুলি থেকে দেখা যায় যে তিনখানি বাদে সব চিত্রিত পুঁথিই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি। পুঁথির পুষ্পিকায় সব ক্ষেত্রেই দাতার নাম পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ধর্মস্থানগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাতারা সমবেত হতেন সে প্রমাণও পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। দাতা পুঁথি-প্রস্তুতির আয়োজন করতেন পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে। নিজের পুণ্য লাভেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি। মহাযান মতাদর্শের প্রেরণায় এই দানের মাধ্যমে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর এই



পুণ্যকীর্তি আচার্য, উপাধ্যায়, মাতা, পিতা সহ সকল জীবের সম্যক জ্ঞান লাভের সহায়ক হবে। এই মহাযান আদর্শের উদ্ধৃতি দেখা যায় সব পুঁথিরই পুষ্পিকায়—'যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়-মাতাপিতৃ পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞান-বাপ্তয় ইতি'।

অধিকাংশ পুঁথিতেই লিপিকরের নাম দেখা যায়। লিপিকরেরা পুঁথিতে তাঁদের স্বাক্ষর রেখেছেন কতকটা পুণ্য লাভের বাসনায় আর কতকটা হয়তো কর্মকৃতির সঙ্গে তাঁদের নাম যুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে। পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সুসমঞ্জস অক্ষরে—কর্মকৃতির এই সৌকর্য দেখে এই শেষোক্ত অভিপ্রায়ও লিপিকরদের অন্তরে ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

পুঁথি লেখা শেষ হলে পুঁথি আসত চিত্রকরদের হাতে। চিত্রকররাও তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করতেন খুবই যত্নের সঙ্গে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের পুঁথিগুলির প্রতিটি চিত্রেই চিত্রকরদের কর্মকুশলতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অথচ কোন চিত্রিত পুঁথিতেই তাঁদের নাম বা স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি।

। ২ ।

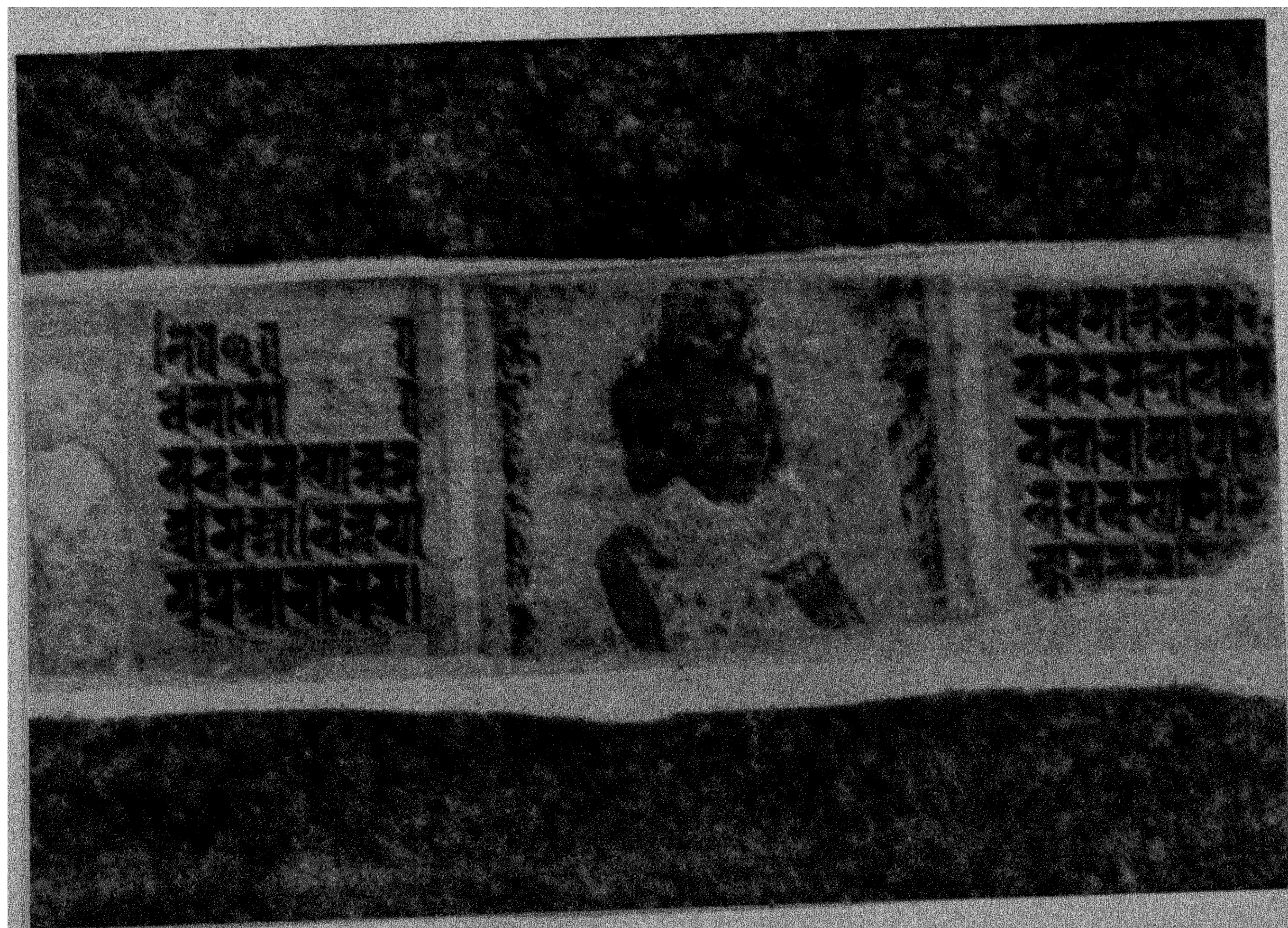
কোন চিত্রকলার আলোচনায় চিত্রাঙ্কন-বিধি সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। চিত্রাঙ্কন একটি দুরূহ বিদ্যা, আর তার প্রক্রিয়াদিও বেশ জটিল—সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অত্যন্ত সীমায়িত। চিত্রকর্মে রত চিত্রকরের কাজ দেখবার সুযোগ হলে হয়তো এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা সম্ভব। পুরানো চিত্রের বিধি-প্রক্রিয়াদি অনুসন্ধানে স্বাভাবিক কারণেই এ সুযোগের একান্ত অভাব। পাশ্চাত্ত্য দেশে চিত্রকর্মের বিধি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবর্তন হয়েছে আর তার প্রণালীও উপনীত হয়েছে বেশ উন্নত স্তরে। আমাদের দেশে এ ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ

নেই বললেই চলে। মূল নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে অঙ্কন-বিধি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার অভাবে সে ধারণা কতকাংশে অপ্রাকৃত থেকে যায়। আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের দেশের সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের অনুদারতার দরুন মূল নিদর্শন পরীক্ষার সুযোগ বেশ কম। লেখক বিদেশী সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের কাছে মূল নিদর্শন দেখবার ও পরীক্ষার ব্যাপারে যে অকুণ্ঠ ও অকৃপণ সহায়তা লাভ করেছেন দেশের দু-একটি সংগ্রহ ব্যতীত সে সুযোগ অন্যত্র পাওয়া যায়নি; বরং কোন ক্ষেত্রে বাধাই এসেছে। তবুও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, তালিকা-ভুক্ত অধিকাংশ পুঁথিই পরীক্ষা করবার সুযোগ লেখক পেয়েছেন।

সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকখানি শিল্প-গ্রন্থে চিত্রাঙ্কন প্রণালী সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শিল্প-গ্রন্থের তথ্য ও মূল চিত্রের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান, এই দুই-এর সমাবেশে এই চিত্রাঙ্কন প্রণালী সম্বন্ধে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত সঙ্গতভাবে করা চলে। এ কথা বলা যায় যে শিল্প-গ্রন্থে বর্ণিত প্রক্রিয়াদি আমাদের চিত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্প-গ্রন্থের তথ্য ব্যবহারে একটি অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা দরকার। শিল্প-গ্রন্থের পাঠ অনেক স্থানে প্রমাদ-সঙ্কুল; স্থানে স্থানে বিচ্যুতিও দেখা যায়। এই সব কারণে উদ্ধৃত পাঠ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থবহ হয় না, আবার কোন ক্ষেত্রে অর্থান্তর ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা অবশ্য আমাদের পরীক্ষা-লব্ধ তথ্যের সঙ্গে শিল্প-শাস্ত্র-গত এমন প্রমাণের উল্লেখ করবার চেষ্টা করব যার অর্থ স্পষ্ট, আর যার তাৎপর্য সম্পর্কে দ্বিমত হবার সম্ভাবনা নেই।

পরমার-রাজ ভোজদেব নিজে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভোজদেব-রচিত কয়েকটি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে একটি শিল্প-গ্রন্থ, নাম 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার'। একাদশ শতকের এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে চিত্রকর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। একসপ্ততিতম অধ্যায়ে গ্রন্থকার চিত্রকর্মের আটটি অঙ্গের উল্লেখ



করেছেন। শ্লোকটিতে কিছু ভ্রান্তি দেখা যায়, বিচ্যুতিও আছে। তৎসত্ত্বেও সমষ্টিগত দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট শ্লোকটির অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার কঠিন নয়। 'অঙ্গ' এই সংজ্ঞাটি গ্রন্থকার চিত্রকর্মের আঙ্গিকের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করেছেন বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর মতে চিত্রকর্ম আটটি অঙ্গে বিভক্ত। (১) বর্তিকা, (২) ভূমিবন্ধন. (৩) লেখ্য ও (৪) রেখাকর্ম, (৫) বর্ণকর্ম, (৬) বর্তনাক্রম, (৭) লেখন বা লেখকরণ. এবং (৮) দ্বিককর্ম (?)। এই আটটি অঙ্গ সমষ্টিগতভাবে চিত্রকর্মের আঙ্গিক নির্দেশ করে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' চিত্রের আটটি গুণের ('গুণাষ্টকং') উল্লেখ করা হয়েছে। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারের' অষ্টাঙ্গ পৃথক পর্যায়ের—এগুলি সবই আঙ্গিক সম্পর্কীয় চিত্র-প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বিশেষ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরের' 'গুণাষ্টক' চিত্র বিচারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য গুণ বিশেষ।

আরও দুখানি শিল্প-গ্রন্থ চিত্রকর্মের আঙ্গিকের আলোচনায় বিশেষ তথ্য-পূর্ণ। একটি হচ্ছে 'অভিলষিতার্থ চিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস'। চালুক্য-রাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। আর একখানি 'শিল্পরত্ন'। ষোড়শ শতকে কেরলবাসী শ্রীকুমার গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই দুই গ্রন্থে 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বর্ণিত চিত্রকর্মের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক পরিপূরক তথ্য পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থের তথ্য অবলম্বনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার আঙ্গিক সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। পালযুগের পুঁথিতেও অনুরূপ আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছিল এ অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয়।

বর্তিকা ঃ 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বর্ণিত চিত্রকর্মের আটটি অঙ্গের প্রথম অঙ্গ বর্তিকা ('বর্তিকা প্রথমা তেষাং')। এটি অবশ্য প্রক্রিয়া পর্যায়ে পড়ে না। চিত্র-কর্মের আঙ্গিকের এটি একটি বিশেষ উপকরণ, সর্বপ্রথম উপকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তিকা এক প্রকারের লেখনী যার সাহায্যে চিত্রের অঙ্কন শুরু করা হয়।

'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' একটি বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও তণ্ডুল চূর্ণ মিশিয়ে বর্তিকা প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। 'মানসোল্লাসে' এ সম্বন্ধে আরও তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কজ্জল ও অন্নমণ্ড মিশিয়ে বর্তিকা তৈরী করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। এই মিশ্রিত পিণ্ডকে যষ্ঠির আকারে ক্রম সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিন্দুতে পরিণত করতে বলা হয়েছে। 'শিল্পরত্ন'-কার এই ধরনের বর্তিকা কিট্ট-লেখনী নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এটি প্রস্তুত হয় পুরোনো লোষ্ট্রচূর্ণ শুকনো গোময় আর জল মিশ্রিত পিণ্ড থেকে। চিত্রের প্রথম আভাস-রেখা অঙ্কনে এই বর্তিকা ব্যবহৃত হত। এ ব্যাপারে বর্তিকার উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কারণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে রেখা মুছে পুনরঙ্কনের কোনও অসুবিধা হত না। এ বর্তিকা বা কিট্ট-লেখনী ব্যবহার হত দেয়ালচিত্রের রেখাঙ্কনে।

আমাদের পুঁথিচিত্রে প্রথম রেখাঙ্কনে এই ধরনের বর্তিকা অনুপযোগী। এই প্রসঙ্গে তারিখ-বিহীন পূর্ব-ভারতীয় একটি পুঁথির (খ তালিকার ১ নং) প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই পুঁথিতে আছে কয়েকটি রেখাচিত্র (চিত্র নং ৪৮, ৪৯, ৫০)। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এগুলি চিত্রাঙ্কনে বর্ণ ব্যবহারের পূর্ববর্তী অবস্থার সূচক। এই রেখাচিত্রগুলি তুলি দিয়ে গৈরিক রঙে আঁকা হয়েছে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তুলিকা অর্থে বর্তিকা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে। অবশ্য তুলিকা অর্থে বর্তিকা ও উপরের শিল্পগ্রন্থে বর্ণিত বর্তিকা দুই বিভিন্ন পর্যায়ের উপকরণ সন্দেহ নেই। আমাদের রেখাচিত্রগুলি লেখনী-প্রস্তুত প্রাথমিক রেখাঙ্কনের ওপর তুলি দিয়ে রঙে টানা হয়ে থাকতে পারে।

ভূমিবন্ধন : ভূমিবন্ধন 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' চিত্রকর্মের দ্বিতীয় অঙ্গ বলে উল্লিখিত হয়েছে ('দ্বিতীয়ং ভূমিবন্ধনং')। নামেই অঙ্গটির অর্থ সুস্পষ্ট। সন্দেহ নেই যে এটি চিত্রের ভূমি বা ক্ষেত্র প্রস্তুত-করণের প্রক্রিয়াদি সম্পর্কীয় ব্যবস্থার নির্দেশ। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' ও 'শিল্পরত্নে' শিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুত-বিধির বিস্তৃত



বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এই বিধি-সমূহ ভিত্তিচিত্রের ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য। দুখানি গ্রন্থেই 'কুড্য' বা 'কুড্যভূমি' শব্দের ব্যবহারে তা স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিল্প-গ্রন্থেই পুঁথিচিত্রের ক্ষেত্র-প্রস্তুতি বিষয়ে কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। 'শিল্পরত্ন'-কার 'ফলক-চিত্রে'র ক্ষেত্র-প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। 'ফলক' শব্দটি কাঠের পাটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। পুঁথির পাটার চিত্র 'ফলক-চিত্রে'র পর্যায়ভুক্ত মনে করাই সঙ্গত হবে। 'ফলক-চিত্র' সম্পর্কে বলা হয়েছে তক্ষণের দ্বারা (তক্ষণ করে) বর্ণ-বিলেপনের উপযোগী 'স্নিগ্ধ' বা মসৃণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন ('ফলকাদৌ তক্ষণেন স্নিগ্ধে বর্ণং বিলেপয়েৎ')। আবার ফলকের স্থায়িত্ব বর্ধনের জন্য কয়েৎবেল আর নিমের নির্যাস ফলকে লেপন করবার বিধির কথাও বলা হয়েছে। আমাদের পুঁথির ও পাটার চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাদা রঙের একটি পাতলা আস্তরণ। পরে বর্ণকর্ম প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

লেখ্য ও রেখাকর্ম : এই দুটি অঙ্গ প্রাথমিক রেখাঙ্কন সম্বন্ধীয় সন্দেহ নেই। এ দুটির পারম্পরিক উল্লেখও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি প্রারম্ভিক দ্রুত রেখাঙ্কন, আকারের মাত্রা বা সীমা টানা যার উদ্দেশ্য ('আকারমাত্রিকা')। দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ রেখা-চিত্র, লক্ষণাদিসহ সমস্ত অবয়বের সম্পূর্ণ আকৃতি অঙ্কন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ('আকার-জনিকা')। এই পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্রে প্রারম্ভিক রেখাঙ্কনের ত্রুটি ইত্যাদির সংশোধন করা হত। এ সম্বন্ধে 'শিল্পরত্নে'র এই নির্দেশটি উল্লেখনীয়—'যত্র লেখা গতা বামং তত্র তান্ নববাসসা। সংমার্জ্য সম্যগালিখ্য তত্তদাকারমুন্নয়েৎ', (অঃ ৪৬, ৪০)। মুঘল চিত্রকলাতেও দুটি প্রাথমিক রেখাঙ্কনের বিধি প্রচলিত ছিল—তাদের যথাক্রমে বলা হত 'বুতবান্ধনা' ও 'টিপাই'।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই শ্লোকটিতে মুদ্রিত পাঠের 'লেখ্য' (কর্ম) অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হবে 'লেপ্য' (কর্ম)। তাঁরা মনে করেন চিত্র-প্রস্তুতির ব্যাপারে

দ্'বার রেখাঙ্কনের প্রয়োজনীয়তা নাই। যুক্তিস্বরূপ তাঁরা বলেন 'লেপ্যকর্ম' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরের এক অধ্যায়ে (৭৩ অধ্যায়ে) দেওয়া হয়েছে, আর এই বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের শ্লোকটিতে উল্লিখিত তৃতীয় অঙ্গটির পাঠ 'লেপ্য' (কর্ম) হওয়াই সমীচীন। লক্ষ করা প্রয়োজন, 'সমরাঙ্গন-সূত্রধারে' 'লেপ্যকর্ম' নামক অধ্যায়টি ক্ষেত্র-প্রস্তুতির মুখ্য প্রক্রিয়া আস্তরণ সম্পর্কীয়; আর এই আস্তরণ প্রক্রিয়া 'ভূমিবন্ধন' নামক চিত্রকর্মের দ্বিতীয় অঙ্গটির অন্তর্গত। তৃতীয় অঙ্গ রূপে উল্লিখিত 'লেখ্য' (কর্ম) স্পষ্টতঃই দ্বিতীয় অঙ্গ হতে পৃথক। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে চিত্রকরেরা সকলেই চিত্র-প্রস্তুতির প্রারম্ভে দুবার রেখাঙ্কনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। প্রথমটি হচ্ছে দ্রুত খসড়া, আর দ্বিতীয় লক্ষণাদি-সহ অবয়বের পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র।

আমাদের একখানি পুঁথির (থ তালিকার ১ নং) রেখাচিত্রের প্রতি আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রগুলি (চিত্র নং ৪৮, ৪৯ ৫০) 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' উল্লিখিত রেখাকর্মের অবস্থাসূচক সন্দেহ নেই। দুখানি রেখাচিত্রে দেখা যায় অবয়বের প্রধান অঙ্গগুলির সমসূত্রে সমান্তরাল রেখা। এই সমান্তরাল রেখাগুলি নিঃসন্দেহে তালমান-জ্ঞাপক। চিত্র-প্রস্তুতির প্রারম্ভে রেখাচিত্র তালমানানুযায়ী অঙ্কিত হত তা জানা যায় আমাদের পুঁথির রেখাচিত্র থেকে।

বর্ণকর্ম ঃ আকার-জনিকা রেখাচিত্র প্রস্তুতির পরের প্রক্রিয়া স্বভাবতই বর্ণা-লেপন। এই দৃষ্টিতে চিত্রকর্মের পঞ্চম অঙ্গের মুদ্রিত পাঠ 'কর্ষকর্ম' অর্থবহ নয়, অনুপযোগীও বটে। কুমারস্বামী এ কারণে এই শ্লোকের 'কর্ষকর্ম' পাঠটি সংশোধন করেছেন 'বর্ণকর্ম' রূপে। চিত্রকর্মের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পারম্পর্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত 'বর্ণকর্ম' পাঠই সমীচীন ও সুসঙ্গত।

বর্ণকর্ম-প্রক্রিয়া ঠিক বুঝতে হলে রঙ (বর্ণ) ও তার আকর সম্পর্কে কিছু



জানা প্রয়োজন। শিল্প-গ্রন্থাদিতে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য-সমূহ ও চিত্রের পরীক্ষাগত প্রমাণ একত্রে অনুধাবনযোগ্য। এই দুই-এর সম্মিলনে আমাদের পুঁথিচিত্রের বর্ণকর্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু সঙ্গত ধারণা করা সম্ভব হবে।

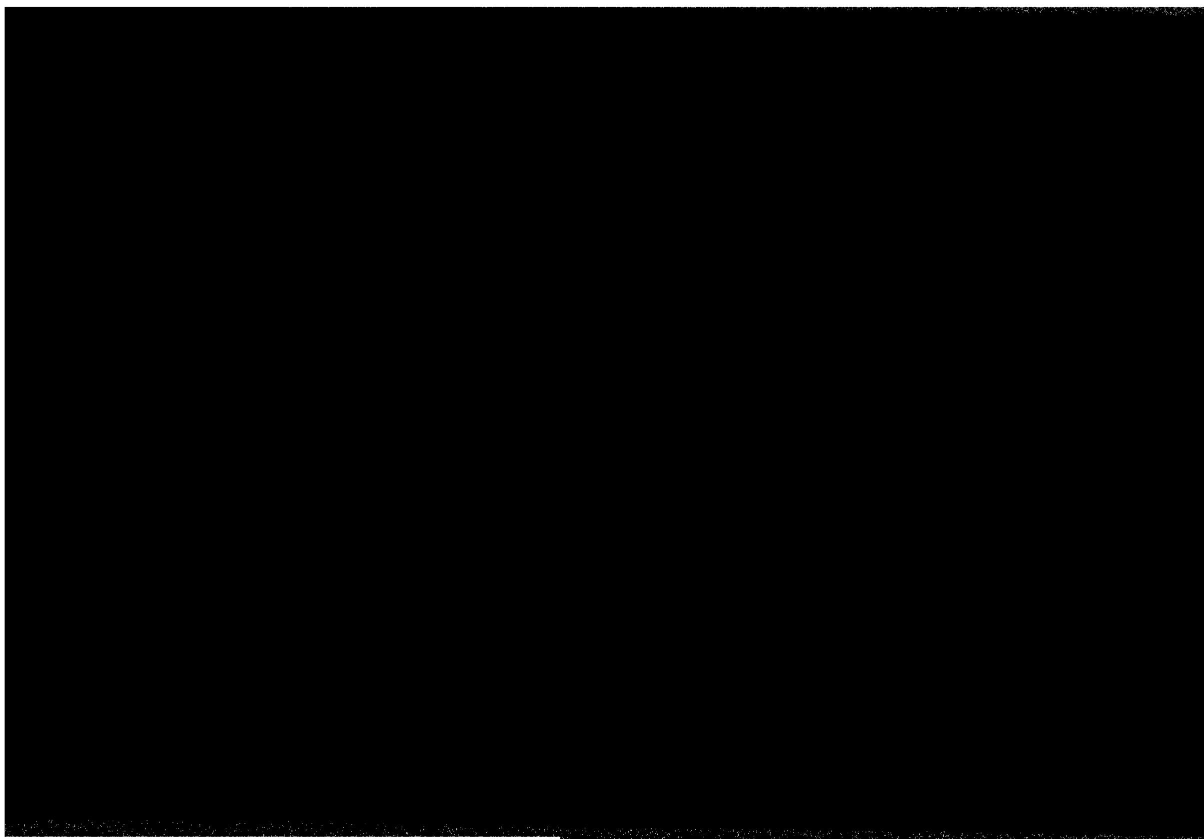
আমাদের চিত্রগুলিতে সাদা (সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ (পীত), নীল (শ্যাম), লাল (রক্ত), কাল (কৃষ্ণ, কজ্জল) ও সবুজ (হরিত) রঙ ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। পূর্ব-মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রঙ উৎপন্ন হয়েছে খনিজ ও শিলাজাত পদার্থ থেকে। কোন কোন রঙের আকর রূপে নীল, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্যেরও প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়া কিছু রঙ তৈরী হয়েছে অন্যান্য মাধ্যমে। শিল্প-গ্রন্থগুলিতে রঙের আকর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। রঙের প্রস্তুতি-প্রণালী সম্পর্কেও বিবরণ অপ্রতুল নয়। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে আমাদের চিত্রে বিভিন্ন রঙের উৎপাদনে শিল্প-গ্রন্থে উল্লিখিত আকর সমূহই ব্যবহৃত হয়েছে, আর উৎপাদন-প্রণালীও ছিল শিল্প-গ্রন্থের বিধি অনু-যায়ী। শিল্পশাস্ত্রের তথ্য ও চিত্রগত প্রমাণ, এই দুই-এর মাধ্যমে আমাদের চিত্রের বর্ণকর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা করা সম্ভব তা একেবারে অযথার্থ হবে না। তবুও মনে রাখা দরকার যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ছাড়া বিভিন্ন রঙের আকর সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয় হওয়া কঠিন।

আমাদের চিত্রে সাদা রঙ ব্যবহৃত হয়েছে চিত্রের ক্ষেত্রাস্তরণে, অবয়বে আর চিত্রে উজ্জ্বলতা সৃষ্টির মানসে। আমাদের চিত্রের সাদা রঙের আকর সম্পর্কে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ব্রেডেনবুর্গ সাহেব চিত্রের এই রঙ সাদা সীসা থেকে প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করেন। মনে রাখা প্রয়োজন সাদা সীসা জলচিত্র-বিধির উপ-যোগী নয়। কোন শিল্প-গ্রন্থেই রঙের আকর হিসাবে সাদা সীসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অজিত ঘোষ মহাশয় চিত্রের সাদা রঙ এক ধরনের সূক্ষ্ম সাদা মাটি বা খড়ি থেকে প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মত আংশিকভাবে সত্য এ অনুমান করা চলে।

বিভিন্ন শিল্প-গ্রন্থে শংখ ও শুক্তিভস্ম শুদ্ধ সাদা রঙের আকর হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের চিত্রের সাদা রঙ শংখ-শুক্তি-ভস্ম থেকে প্রস্তুত হয়েছে এ অনুমান অসঙ্গত বা নিরর্থক নয়। শংখ-শুক্তি-ভস্ম ছাড়া এক ধরনের সাদা মাটি মাটি ('সিত মৃৎ') সাদা রঙের আর একটি আকর রূপে উল্লিখিত হয়েছে 'শিল্পরত্নে'। আমাদের চিত্রের ক্ষেত্রান্তরণে এই সাদা মাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

হলুদ বা পীত রঙের ব্যবহার আমাদের চিত্রে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। চিত্রে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অধিকাংশই পীত বর্ণের (কনক-বর্ণ, সুবর্ণবর্ণোজ্জ্বল, ইত্যাদি) বলে প্রতিমালক্ষণে বা সাধনমালায় কথিত। সে কারণে পীত বর্ণের ব্যবহার বহুল হওয়াই স্বাভাবিক। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' আদি বিভিন্ন শিল্প-গ্রন্থে হরিতাল পীত বর্ণের আকর বলা হয়েছে। আমাদের চিত্রে হরিতাল থেকে হলুদ রঙ তৈরী হয়েছে এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। হরিতাল দু-শ্রেণীর পাওয়া যায়; দেশী ভাষায় তাদের নাম 'দগদী' ও 'বর্গী'। বর্গী শ্রেণীর হরিতাল হলুদ রঙ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এই শ্রেণীর হরিতাল-চূর্ণ বার বার জলে আলোড়ন ও সিঞ্চন করলে এক ঈষদুজ্জ্বল পীত রঙের উদ্ভব হয়। আর এই ধরনের পীত রঙের ব্যবহারই দেখা যায় আমাদের চিত্রে।

ভারতীয় ঐতিহ্যে নীল বা শ্যাম রঙ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় চিত্রকলার সব যুগেই নীল রঙের ব্যবহার হয়েছে বহুল পরিমাণে, আর এই রঙও পরিস্ফুট হয়েছে অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে। আমাদের চিত্রেও নীল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ছায়ে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' নীল রঙের আকর রূপে নীল গাছের উল্লেখ আছে। অন্যান্য শিল্প-গ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। 'মানসোল্লাসে'র নীলি নীলের সমার্থক বলে মনে হয়। কিছুকাল আগেও এই উদ্ভিজ্জ নীল রঙের ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। আমাদের চিত্রেও এই উদ্ভিজ্জ নীল রঙই ব্যবহার করা হয়েছে, আর তার বিভিন্ন ছায় উৎপন্ন হয়েছে অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে। নীল রঙের আর একটি আকর রাজাবর্ত।



বিভিন্ন শিল্প-গ্রন্থে প্রায়ই রাজাবর্তের উল্লেখ দেখা যায়। অজন্তা গুহার ভিত্তি চিত্রে উজ্জ্বল ও ভাস্বর নীল রঙ পরিস্ফুটনে রাজাবর্তের ব্যবহার হয়েছিল বলে জানা যায়। আমাদের পুঁথিচিত্রে কিন্তু রাজাবর্তের ব্যবহার দেখা যায় না।

আমাদের চিত্রে নানা ছায়ে লাল অথবা রক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্প-গ্রন্থে লাল রঙের আকর রূপে বিভিন্ন দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলিতে দরদ (লাল সীসা), লাক্ষা-রস বা অলক্তক (আলতা), গৈরিক (গিরি মাটি) প্রভৃতি থেকে লাল রঙের বিভিন্ন ছায়-প্রস্তুতির নির্দেশ পাওয়া যায়। পাল যুগের পুঁথিচিত্রে লাল রঙ আর তার বিভিন্ন ছায়ের জন্য এই সব আকর দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছিল অনুমান করা অসংগত হবে না। এই ধরনের আকর পদার্থ থেকে সঠিক ছায়ের রঙ নিষ্কাশন বিশেষ জটিল ও দুরূহ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে শিল্প-গ্রন্থগুলিতে অতি সামান্যই তথ্য পাওয়া যায়। মূল পদার্থগুলি চূর্ণ করে জলে আলোড়ন ও সিঞ্চন করার বিধি দেখা যায় গুজরাট অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে। নির্দিষ্ট ছায়ের রঙের জন্য এই প্রক্রিয়া বারে বারে প্রয়োগ করা হয়। অনুমান করা অসংগত নয় যে পালযুগের চিত্রকরেরাও এই সব বিধি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এমনও হতে পারে যে তাঁরা অনুরূপ কোন প্রথা উদ্ভাবন করে থাকবেন।

কাল (কৃষ্ণ) রঙ সব ক্ষেত্রেই কাজল থেকে তৈরী করার বিধি শিল্প-গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে। আমাদের চিত্রেও এই রঙের প্রস্তুতি একই বিধিতে হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন।

শিল্প-গ্রন্থগুলির মতে সাদা, হলুদ, নীল, লাল ও কাল (কৃষ্ণ, কজ্জল) রঙ শুদ্ধ ও মুখ্যবর্ণ রূপে পরিচিত। এই পাঁচটি রঙ ছাড়াও সবুজ বা হরিৎ বর্ণও আমাদের চিত্রে ব্যবহার হয়েছে প্রায় সমানভাবে। সবুজ রঙ শিল্প-গ্রন্থে মুখ্য ও শুদ্ধ-বর্ণ রূপে স্বীকৃত হয়নি। এই রঙ মিশ্র-বর্ণের তালিকায় দেখা যায় স্পষ্টত স্বাভাবিক কারণেই। নীল ও হলুদের সংমিশ্রণে সবুজের উদ্ভব, আর সবুজের সঙ্গে সাদার

অনুপাতানুযায়ী মিশ্রণে সৃষ্টি হয় সবুজের বিভিন্ন ছায়। আমাদের চিত্রের সবুজে এই বিধিই অনুসৃত হয়েছে অনুমান করা চলে। জানা যায় অজন্তার ১৬নং গুহার চিত্রে আর ইলোরায় সবুজ রঙ প্রস্তুত হয়েছিল এক ধরনের সবুজ মাটি থেকে। আমাদের চিত্রেও এই মাটির ব্যবহারের সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

উপর্যুক্ত বর্ণের বিভিন্ন ছায় উৎপাদিত হয় অন্য রঙের সঙ্গে মিশ্রণের দ্বারা। শিল্প-গ্রন্থে মিশ্রবর্ণ পর্যায়ে তাদের তালিকা পাওয়া যায়। 'মানসোল্লাস' ও 'শিল্প-রত্ন' হতে এরূপ দুটি তালিকার উদ্ধৃতির আবশ্যকতা দেখা যায় আমাদের চিত্রের আঙ্গিক-বিচার প্রসঙ্গে।

'মানসোল্লাস' ঃ

১। দরদ ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে—লাল পদ্মের বর্ণচ্ছায়।
২। গৈরিক ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে—ধূম্রবর্ণচ্ছায়।
৩। কজ্জল ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে—ধূম্রবর্ণচ্ছায় (২)।
৪। নীল ও শঙ্খ-সুধা মিশ্রণে—ধূসরবর্ণচ্ছায় (পারাবত রঙ)।
৫। কজ্জল ও গৈরিক মিশ্রণে—বিস্কুট রঙ।
৬। কজ্জল ও লাক্ষারস মিশ্রণে—বিস্কুট রঙ (২)।
৭। লাক্ষারস ও নীল মিশ্রণে—রক্তনীলচ্ছায়।

'শিল্পরত্ন' ঃ

৮। সিত ও রক্ত মিশ্রণে—গৌরচ্ছবি।
৯। শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত সমাংশে মিশ্রণে—শরচ্ছবি (শারদাকাশের ন্যায় বর্ণ)।
১০। শ্বেত ও কৃষ্ণ মিশ্রণে—গজবর্ণ (ধূসর)।
১১। রক্ত ও পীত সমাংশে মিশ্রণে—অগ্নিবর্ণ।
১২। দুই ভাগ রক্ত ও এক ভাগ পীত মিশ্রণে—অতিরক্ত।



১৩। দুই ভাগ পীত ও এক ভাগ শ্বেত মিশ্রণে—পিঙ্গল।
১৪। হরিতাল ও শ্যাম (নীল) মিশ্রণে—শুকপক্ষচ্ছায় (সবুজ)।
১৫। লাক্ষারস ও হিঙ্গুদ (সিন্দুর) মিশ্রণে—অতিরক্ত।
১৬। লাক্ষারস ও কৃষ্ণ মিশ্রণে—জম্বুফলচ্ছায়।
১৭। কৃষ্ণ ও নীল মিশ্রণে—কেশবর্ণ।
১৮। লাক্ষারস, জাতিফল (জায়ফল) ও সিত সমভাবে মিশ্রণে, কখনও সিন্দুর সহ—সম্মিশ্র বর্ণ, যে বর্ণে বিভিন্ন ছায় প্রতিফলিত হয়।

এই বর্ণচ্ছায় গুলির অধিকাংশই আমাদের চিত্রে দেখা যায়। আমাদের চিত্রে প্রতিটি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ছায়ে।

তুলি বা তুলিকা দিয়ে চিত্রে বর্ণ লেপন করা হয়। সুতরাং বর্ণকর্ম প্রসঙ্গে তুলিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। পাল যুগের চিত্রকরেরা কি ধরনের তুলিকা ব্যবহার করেছেন তা আমাদের জানা নেই। তার কোন নিদর্শনও বর্তমানে বিদ্যমান নেই। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শিল্প-গ্রন্থগুলিতে বর্ণ লেপনের উপযোগী তুলিকা সম্পর্কে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আর এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে আমাদের চিত্রকরেরা শিল্প-গ্রন্থের অনুরূপ তুলিকা ব্যবহার করেছেন। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার', 'মানসোল্লাস' ও 'শিল্পরত্নে' তুলিকা সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য আছে যার সমষ্টিগত মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তুলিকা শব্দটি সকলেরই পরিচিত আর সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দটির উল্লেখও অপ্রচুর নয়। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' তুলিকা 'কূর্চ' নামে অভিহিত হয়েছে, অন্য দুটি গ্রন্থে 'লেখনী' নামে। শিল্প-গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের তুলিকার বিবরণ আছে, এই প্রকার-ভেদ করা হয়েছে তুলিকার স্থূলতা অনুসারে। এই প্রকার-ভেদের আবশ্যকতা সব সময়ই দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকারের তুলিকা ব্যবহৃত হত অঙ্কন ও বর্ণকর্মের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী। অঙ্কনে যে প্রকারের তুলিকা প্রয়োজন তা বর্ণালেপনের অনুপযোগী; আবার সূক্ষ্ম বর্ণারোপে বা চিত্রের বর্তনা-

সৃষ্টিও উজ্জ্বলতা আনয়নে প্রয়োজন হত ভিন্ন প্রকারের তুলিকা। এই কারণেই তুলিকার প্রকার-ভেদ বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শিল্প-গ্রন্থে।

'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' পাঁচ প্রকারের তুলিকার উল্লেখ আছে। প্রকার-ভেদ পূর্বেই বলা হয়েছে স্থূলতা অনুসারে। এই বর্ণনায় রোমজ তুলিকার সঙ্গে উদ্ভিজ্জ তুলিকারও উল্লেখ আছে। তৃণজ তুলিকার উল্লেখ 'শিল্পরত্নে'ও পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ বা তৃণজ তুলিকার ব্যবহার স্বভাবতঃই সীমিত ছিল বৃহদাকার ভিত্তিচিত্রে সমমাত্রিক বর্ণালেপনের ব্যাপারে। আমাদের ক্ষুদ্রাকার পুঁথিচিত্রে এ ধরণের তুলিকা অনুপ-যোগী, আর তার ব্যবহার হয়নি এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। 'মানসোল্লাস' ও 'শিল্প-রত্নে' তুলিকা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম এই তিন প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে দেখা যায়। স্থূল পর্যায়ের তুলিকা প্রয়োজন হত বর্ণালেপনে, মধ্য পর্যায়ের অঙ্কনে ও বর্তনা-সৃষ্টিতে, আর সূক্ষ্ম পর্যায়ের তুলিকা আবশ্যক হত চিত্রের স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা আনয়নে—এক কথায় চিত্রের পরিস্ফুটনে। তুলিকা সম্পর্কে 'শিল্পরত্নে'র বিবরণ কিছু বিশদ। প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য 'শিল্পরত্ন'-কার স্থূল, মধ্য ও সূক্ষ্ম পর্যায়ে প্রতিটি রঙ-এর জন্য তিনটি করে মোট নয়টি তুলিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তুলিকার প্রস্তুতি সম্বন্ধেও 'শিল্পরত্নে' কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। স্থূল পর্যায়ের তুলিকা তৈরী হত বাছুরের কানের লোম দিয়ে, মধ্য পর্যায়ের ছাগোদরের লোমে আর সূক্ষ্ম পর্যায়ের তুলিকা তৈরী হত চিক্রোড়-পুচ্ছের লোমে। 'চিক্রোড়' শব্দের অর্থ কেউ কেউ করেছেন কস্তুরী-গন্ধী মূষিক-জাতীয় এক প্রাণী, তার পুচ্ছের লোম খুব সূক্ষ্ম এই কারণে সূক্ষ্ম পর্যায়ের তুলিকা তৈরীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এই লোম দিয়ে। প্রতিটি পর্যায়ের তুলিকার জন্য নির্দিষ্ট লোম সংগ্রহ করে তুলিকা-দণ্ডাগ্রে শঙ্কুর সঙ্গে সুতো বা লাক্ষা দিয়ে বাঁধবার বিধানও 'শিল্পরত্নে' পাওয়া যায়। আমাদের চিত্রকরেরাও বিভিন্ন পর্যায়ের অনুরূপ তুলিকা ব্যবহার করেছেন বলে মনে করা যায়।



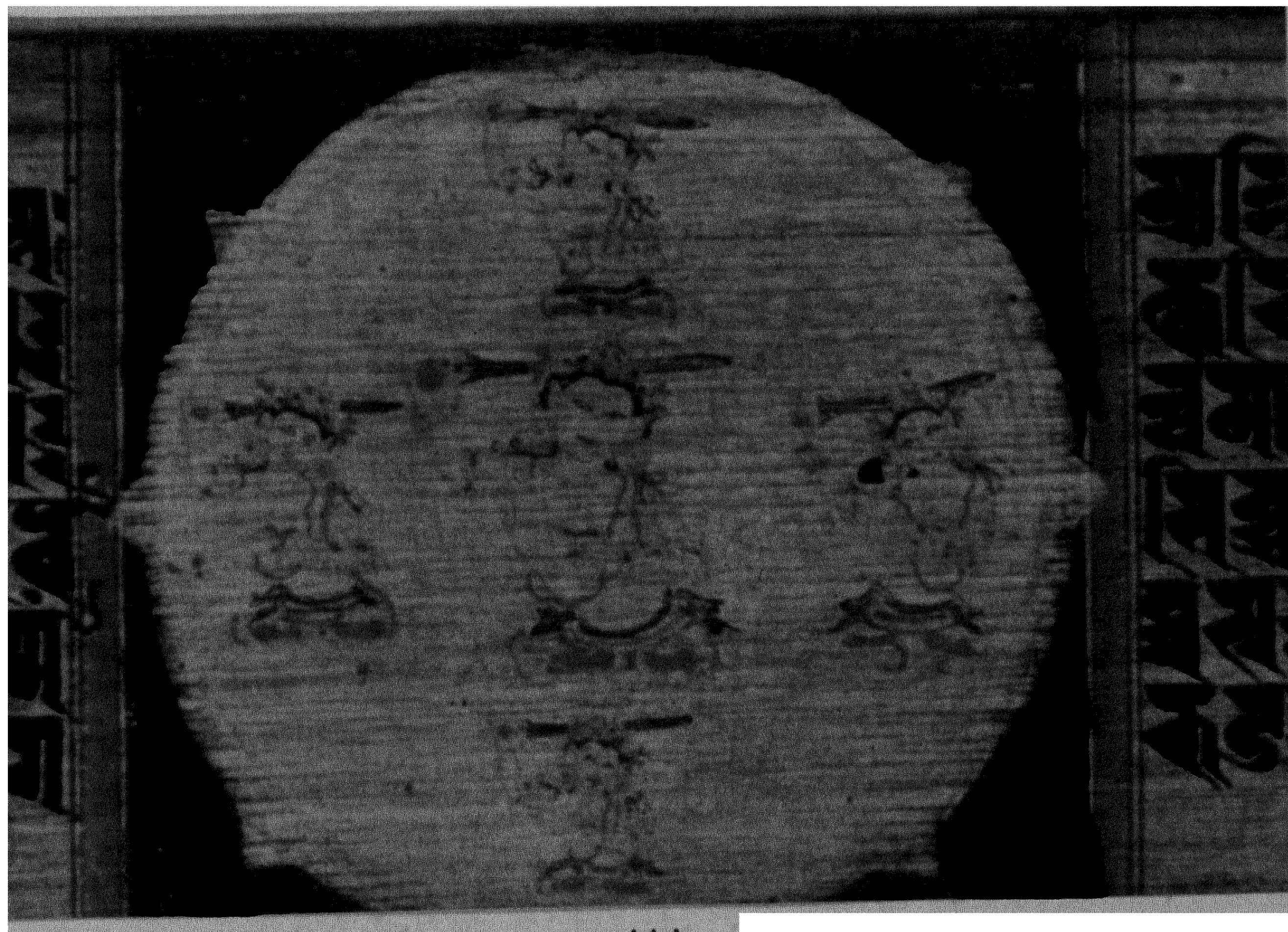
শিল্প-গ্রন্থসমূহে বর্ণ ও তুলিকা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেলেও চিত্রে বর্ণ-লেপনের প্রক্রিয়াদি বা চিত্রের প্রসাদ-গুণ সৃষ্টিতে রঙের কুশলী প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই বললেই চলে। 'মানসোল্লাসে' এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায় ঃ যথা—উচ্চাবচ প্রদর্শনে যথাক্রমে উজ্জ্বল ও ঘোর বর্ণের ব্যবহার; পৃথকত্ব সৃষ্টির মানসে পীত ও রক্তের সঙ্গে যথাক্রমে গৌর ও নীল রঙের প্রয়োগ; ঘোর ছায়ের নীল প্রয়োগে শুদ্ধ নীলের পরিস্ফুটন; নানা দেবদেবী ও বিভিন্ন জাতির মানবের চিত্রে নির্দিষ্ট রঙের ব্যবহার; গাছপালা, ফল-ফুল, জীব-জন্তু ইত্যাদির চিত্রে প্রকৃত রঙের প্রয়োগ; ইত্যাদি। এই যে স্বল্প তথ্য তাও প্রাথমিক ধরনের; আঙ্গিকের যে সূক্ষ্ম ও কুশলী প্রয়োগে এই সবের প্রকাশ সম্ভব সে সম্বন্ধে কোন বিবরণই শিল্প-গ্রন্থে নেই। 'শিল্পরত্নে' ও এই ধরনের কিছু প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায় : যেমন নিম্নোন্নতাদি চিত্রে দেখাতে হবে; রঙের প্রয়োগে শ্যাম ও উজ্জ্বলতার ভেদ রক্ষার প্রয়োজন; ইত্যাদি। এই সব প্রাথমিক ও মৌলিক তথ্য ছাড়া চিত্রকর্মে বর্ণের যে কুশলী ও নিপুণ প্রয়োগে চিত্রের পরিস্ফুটন ও দীপ্তি উন্মীলন, বা চিত্রে বিভিন্ন আভাস সৃষ্টি সম্ভব সে সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রকারেরা নীরব। মনে রাখা প্রয়োজন, শিল্পশাস্ত্র-কারেরা ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু তাঁদের জ্ঞান যে কোনও তত্ত্বের মূলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যবহারিক বা প্রযুক্তি জ্ঞান তাঁদের ছিল অত্যন্ত সীমায়িত। তাঁদের বিবরণে মূল তথ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারিক তথ্য আশা করা সঙ্গত নয়। রঙের সূক্ষ্ম প্রয়োগ আর প্রকার ভেদে বিভিন্ন আভাস সৃষ্টি, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া একমাত্র কুশলী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

পাল যুগের চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল জল-রঙ। এই জল-রঙের দৃঢ়বদ্ধতা সম্পাদনে ও তার স্থায়িত্ব বর্দ্ধনে উপযুক্ত প্রক্রিয়াদি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'শিল্পরত্নে' এক প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কপিত্থ (কয়েতবেল) ও নিম্ব (নিম) নির্যাস, দরদ ব্যতীত, সব রঙের সঙ্গে ব্যবহারের নির্দেশ দেখা যায় এই গ্রন্থে। এই দুটি নির্যাস ব্যবহার শংখ-শুক্তি ভস্মে প্রস্তুত ধবল (সাদা) বর্ণের ও কজ্জলে প্রস্তুত

কৃষ্ণ (কাল) বর্ণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশস্ত বলে গ্রন্থকার মত প্রকাশ করেছেন। দরদ রঙের ক্ষেত্রে শুধু নিম্ব নির্যাস ব্যবহারের নির্দেশ আছে। পাল যুগের চিত্রকরেরা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এ অনুমান অসঙ্গত মনে হবে না।

বর্তনাক্রম ঃ 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' চিত্রের ষষ্ঠ অঙ্গটি 'বর্তনাক্রম' নামে অভিহিত। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'র মতে চিত্রের একটি বিশেষ প্রসাদ-গুণ বর্তনা, তার প্রশংসায় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মুখর হয়েছেন। 'রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যাঃ বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ' এই শ্লোকার্ধে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-কার চিত্রের দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। আচার্যদের প্রশংসিত 'রেখা' শব্দটি স্বয়ং অর্থবহ। রেখা-সৌষ্ঠবই যে চিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ তা সর্বজনস্বীকৃত। সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্র-বিচারে রেখার সাদর স্বীকৃতির ভূয়িষ্ঠ উদাহরণ দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশেও রেখা-সৌকর্যই শিল্প বিচারে মুখ্য মান, অনেক শিল্পীর মতে একমাত্র মান রূপে উল্লিখিত।

বর্তনা শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতে কিছু অস্পষ্টতা দেখা যায়। কারও মতে চিত্রে ছায়াতপ-এর প্রতিফলনই বর্তনা রূপে অভিহিত। শ্রীযুক্ত কুমারস্বামীর মতও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। 'বর্তনা'র তাৎপর্য সম্পর্কে কুমারস্বামীর উক্তিটি উদ্ধৃতির যোগ্য এই প্রসঙ্গে—'বর্তনা' means shading, "not of course shading intended to produce effects of light and shade, but that kind of shading of receding areas which produces an effect of roundness or relief."
অর্থাৎ ছায়াতপ প্রতিফলনের অতিরিক্ত চিত্রের কিছু গুণ বর্তনা শব্দের অর্থে নিহিত আছে, আর সেই গুণ দেখা যায় নিম্নোন্নত বা নতোন্নত অংশের স্পষ্ট ও স্বাভাবিক বিভাজনে ও পরিস্ফুটনে। এই নতোন্নত অংশের বিভাজনের উপর নির্ভর করে দেহের সুষ্ঠু গড়ন, আর তার বৈভবের পূর্ণ প্রকাশ। দ্বিমাত্রিক চিত্রে তার আভাস সৃষ্টি হয় যেমন রেখার সাবলীল টানে, তেমনই রঙের সুসমঞ্জস প্রয়োগে—উজ্জ্বল থেকে ক্রমশ ঘোর ছায়ের রঙের ব্যবহারে দেহের উচ্চাবচ অংশের সাদৃশ্যগত স্পষ্টী-



করণে। সমষ্টিগত ভাবে রচনার ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহারে ভেদ ঘটিয়ে এই বর্তনা-সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিতে বর্তনা শব্দ ইংরাজী 'modelling quality' বা 'plasticity' শব্দের সমপর্যায়ের। চিত্রে এই গুণের উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' বর্তনাক্রম নামে অঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে বর্ণকর্ম নামক অঙ্গের অব্যবহিত পরে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে গ্রন্থকার এই স্থলে বর্ণ-বর্তনার কথাই বলেছেন। আর এ বর্ণ-বর্তনার ব্যবহার আমাদের চিত্রে দেখা যায়।

ছায়াতপ প্রতিফলনের অর্থে বর্তনার উল্লেখ দেখা যায় 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'। এই অর্থে বর্তনা-সৃষ্টি সম্ভব হয় তিন রকমের প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' এই তিনটি প্রক্রিয়া যথাক্রমে অভিহিত হয়েছে 'পত্রা', 'গৈরিকা' আর 'বিন্দুজা' নামে। প্রথম ও তৃতীয়টির অর্থ সুস্পষ্ট। প্রথমটি নিঃসন্দেহে পত্রের শিরার আকারে সূক্ষ্ম রেখায় ছায়া-সৃষ্টির প্রয়াস সূচিত করে। তৃতীয় প্রক্রিয়াতে ছায়া-সৃষ্টি হয় ঘন-সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র বিন্দু ব্যবহার করে, আর এই বিন্দু অঙ্কিত হয় তুলিকা সোজাভাবে ধরে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির নাম মুদ্রিত পাঠে আছে 'গৈরিকা'। এই শব্দটি এ প্রসঙ্গে অর্থবহ বলে মনে হয় না। পণ্ডিতেরা শব্দটির পাঠ সংশোধন করেছেন বিভিন্ন রকমে। কুমার-স্বামী পাঠ সংশোধন করেছেন 'আহৈবিকা', ক্রামরিশ 'ঐরিকা' আর মোতিচন্দ্র 'হৈরিকা'। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে আসল শব্দটি 'রৈখিকা' হবার সম্ভাবনা আছে কিনা? উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'রৈখিকা' পাঠ অন্যান্য পাঠ হতে অযৌক্তিক নয়, বরং বেশী যুক্তিসহ। সূক্ষ্ম সমান্তরাল ঘন-সন্নিবিষ্ট রেখা দিয়ে ছায়া-সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য জগতে—যার সাধারণ নাম hatching। 'রৈখিকা' শব্দটি এই ধরণের প্রক্রিয়া বোঝাতে পারে। এ পাঠ গ্রহণে অবশ্য সামান্য বাধা দেখা যায় 'পত্রা' ও 'রৈখিকা' পদ্ধতির অনুরূপ প্রক্রিয়ায়। উপরের এই তিন ধরণের বর্তনা-প্রক্রিয়া একখানি প্রাচীন শিল্পগ্রন্থে উল্লিখিত হলেও পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগের ভারতীয় চিত্রে তার ব্যবহার দেখা যায়নি। আমাদের পুঁথিচিত্রেও তার প্রয়োগ নেই। কুমারস্বামী

'আহৈবিকা' পাঠ অবলম্বনে প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন রঙের বিভিন্ন ছায়ে তরঙ্গের মত উচ্চাবচ প্রদর্শনের প্রয়াস রূপে। এই পাঠ ও ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করলে এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আমাদের চিত্রে বর্তমান।

লেখন বা লেখকরণ : 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধারে' চিত্রকর্মের এই সপ্তম অঙ্গটিও রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় সন্দেহ নেই। বর্ণকর্মের পর নতুন করে রেখা টানার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত। 'লেখন' বা 'লেখকরণ' হচ্ছে এই অন্ত্য-রেখাঙ্কন। এই রেখা অঙ্কিত হয় অবয়বের রঙের বিপরীত বর্ণে, আর এই রেখাঙ্কনে চিত্রের রেখা চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হয়। আমাদের চিত্রে এই অন্ত্য-রেখা আঁকা হয়েছে কাল অথবা লাল রঙে।

দ্বিককর্ম : চিত্রকর্মের সমাপ্তি হয় বলা যায় এই অন্ত্য-রেখাঙ্কনে। অন্ত্য-রেখাঙ্কনে চিত্র সমাপ্ত হয় প্রযুক্তি বিদ্যার দিক থেকে। কিন্তু শিল্পীর মানস প্রকাশে আরও কিছু যথোচিত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় চিত্রের সমাপ্তিতে। আভাস-সৃষ্টি, উজ্জ্বলতা-সম্পাদন, প্রসাদগুণ-বর্ধন ইত্যাদি ব্যাপারে কুশলী শিল্পী স্বকীয় বিধি প্রয়োগের আবশ্যকতা অনুভব করেন। ইংরেজীতে এই ধরনের বিধিসমূহকে বলা হয় 'finishing touches'। 'সমরাঙ্গণ সূত্রধারে' উল্লিখিত 'দ্বিককর্ম' নামে অষ্টম অঙ্গটি হয়তো এই ধরণের বিধি প্রয়োগের নির্দেশ। মনে রাখা প্রয়োজন চিত্র সম্পূর্ণ হয় শিল্পীর স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বিধি প্রয়োগে। তখনই হয় চিত্রের পূর্ণ উদ্ভাসন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'দ্বিককর্ম' পাঠটির পরিবর্তে এই অঙ্গটির সঙ্গত পাঠ 'দীপকর্ম' হতে পারে বলে মনে হয়।

কাঠের পাটার চিত্রের ক্ষেত্র (চিত্র নং ৩) পুঁথির চিত্রের ক্ষেত্র থেকে অপেক্ষাকৃত সুপরিসর এ কথা আগেই বলা হয়েছে। পাটার চিত্র অঙ্কিত দেখা যায় লাল রঙের পশ্চাৎপটে। পুঁথির পত্রের চিত্র আঁকা হয়েছে ঘোর ছায়ের পশ্চাৎপটে।



॥ চার ॥

চিত্র-কথা

চিত্র-প্রস্তুতির সমস্ত আঙ্গিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে আমরা পাই সম্পূর্ণ চিত্র। আঙ্গিক-কথার পরে চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই অনুভূত হয়।

চিত্র আলোচনার শুরুতে চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-গ্রন্থের পুঁথিতে এই ধরনের চিত্র রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চিত্রের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। দু-একটি ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তার প্রতি পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মূলতঃ বলতে গেলে পুঁথি নির্বিশেষে সব সময়ই চিত্রিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মহান জীবনের প্রধান ঘটনাবলী আর বৌদ্ধ প্রতিমা-শাস্ত্রোক্ত অসংখ্য দেব দেবীর রূপ। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে ভগবান বুদ্ধের জীবনের আটটি মুখ্য ঘটনা কীর্তন আর চিত্রণের যোগ্য। যেমন—১। লুম্বিনী বনে গৌতম বুদ্ধের জন্ম; ২। বুদ্ধগয়ায় বোধিলাভ; ৩। ইসিপতনের (সারনাথের) মৃগদাবে ধর্মচক্র-প্রবর্তন; ৪। কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ; ৫। শ্রাবস্তী নগরে মহাপ্রাতিহার্য; ৬। সঙ্কাশ্যে দেবাবতরণ; ৭। রাজগৃহ নগরে নালগিরি-বশীকরণ; আর ৮। বৈশালীর আম্র বনে বানরের মধুদান। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রে এই ঘটনাবলী বারবার বর্ণিত হয়েছে প্রচলিত বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী। আমাদের পুঁথিতেও এই ঘটনাবলীর চিত্রণ দেখা যায় প্রায়শঃ পুঁথি-প্রস্তুতির অপরিহার্য অঙ্গ রূপে। এছাড়া নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর রূপও বার বার চিত্রিত হয়েছে এইসব পুঁথিতে। ধর্মগ্রন্থের পুঁথিতে এই ধরনের চিত্রের সম্বন্ধ ও সার্থকতা নির্ণয় করা আবশ্যক বলে মনে হবে।

আমরা আগেই বলেছি তিনখানি (গ তালিকার ৩, ১৩ ও ১৪ নং) বাদে আমাদের জানা সব চিত্রিত পুঁথিই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার; একখানি হচ্ছে পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার (ক তালিকার ১৫ নং)। বাকী পুঁথিগুলি বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুলিপি—এই পর্যায়ের পুঁথির মধ্যে পঞ্চরক্ষা নামক একখানি তন্ত্র-গ্রন্থের অনুলিপির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী; তাছাড়াও আছে তন্ত্র পর্যায়ের আরও কিছু গ্রন্থের অনুলিপি। পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বিশেষে সব পুঁথিতেই চিত্র দেখা যায় একই ধরনের আর একই শ্রেণীর, যার উল্লেখ আমরা গোড়াতেই করেছি।

সূক্ষ্মতর পর্যালোচনায় দেখা যায় আমাদের জানা পুঁথির মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পুঁথি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামগ্রিক চিত্রসংখ্যার অনুপাতে প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথির চিত্রও সংখ্যায় অনেক বেশী। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও বিচার। এই গ্রন্থের পুঁথিতে চিত্রাঙ্কনের কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই যুগের চিত্রিত পুঁথির মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পুঁথি সংখ্যায় সর্বাধিক। এই সমস্যার সঠিক সমাধান আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ বলেই মনে হবে।

বৌদ্ধ উপাসকদের মানসে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ সকল তথাগত জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ; আর এই গ্রন্থের অনুলিপির দান, আবৃত্তি ও অর্চনা বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত। এই মানসের প্রতিফলন দেখা যায় সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে প্রজ্ঞাপারমিতার কল্পনায়। আমাদের কয়েকখানি পুঁথিতে গ্রন্থের শুরু হয়েছে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার নিম্নোক্ত বন্দনায়—

নির্বিকল্পে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে
যা ত্বং সর্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈ নিরীক্ষ্যসে॥



আকাশমিব নির্লেপা নিস্প্রপঞ্চা নিরক্ষরা।
যস্তাং পশ্যতি ভাবেন সঃ পশ্যতি তথাগতম্ ॥

এই বন্দনায় সকল জ্ঞানের উৎস ও প্রতীক প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ আর জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা একই ধারায় কীর্তিতা হয়েছেন। এই দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা-পারমিতা গ্রন্থের পুঁথিতে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রাঙ্কনের সম্ভাব্য কারণ পাওয়া যায়। আর এই দেবীর চিত্র আছে প্রতিটি চিত্র-সংযুক্ত প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে। কিন্তু আমাদের পুঁথিচিত্রের অন্য সব বিষয়বস্তু—যেমন বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী বা অন্যান্য অসংখ্য দেবদেবীর রূপ—এসবের সঙ্গে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এসবের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে। এমনকি প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে চিত্রিত অনেক দেবদেবীর কল্পনা বৌদ্ধ প্রতিমা-মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ রচনার অনেককাল পরে।

পুঁথির তত্ত্ব আর চিত্রের বিষয়বস্তুতে এই যে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা অনেক পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। দুইয়ের সম্বন্ধহীনতা দেখে তাঁরা এই চিত্রগুলিকে ঠিক পুঁথি-চিত্রের পর্যায়-ভুক্ত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে এগুলি পড়ে নিছক অলংকরণের পর্যায়ে; আর এই অলংকরণেও, তাঁরা আরও বলেন, কোন নির্দিষ্ট বিধি অনুসৃত হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পুঁথি শুধু একক ভাবেই সংখ্যা-গরিষ্ঠ নয়, এই পুঁথির চিত্র সমষ্টিগত ভাবে সংখ্যায়ও সব চাইতে বেশী। আবার, চিত্রগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করলে এগুলো যথেচ্ছ অলংকরণ মনে করতেও স্বতঃই দ্বিধা জাগে। প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিতে এই ধরনের চিত্রাঙ্কনের পেছনে একটা সচেতন মনোভাব ও অভিপ্রায়ের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সংগত কারণেই।

পালযুগের এই পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্র আর তার নেপালী সমপ্রকাশ সে যুগের বৌদ্ধ ধর্মমানসের বিশেষ প্রতিধ্বনি বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখনকার বৌদ্ধধর্ম প্রজ্ঞাপারমিতাদর্শের সঙ্গে তন্ত্র-বিশ্বাসের সমন্বয় মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত Edward Conze এই মত প্রকাশ করেছেন যুক্তিগ্রাহ্য নানা তথ্য-প্রমাণাদির অবলম্বনে। পরমসৌগত পাল সম্রাটরা প্রজ্ঞাপারমিতাদর্শ আর তন্ত্র-বিশ্বাস দুইয়েরই পোষকতা করতেন। আর তার ফলে বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হল এমন এক মন্ত্রময় ক্রিয়াকাণ্ড-বহুল আচারে যার তত্ত্ব ও রহস্য অনুধাবন একমাত্র দীক্ষিতদের পক্ষেই সম্ভব। পুঁথির চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে এই রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের মতাদর্শ।

যে আদর্শের প্রেরণায় প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি চিত্রখচিত হয়েছিল সে আদর্শের উৎস দেখা যায় প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থেই। এই গ্রন্থে যে তত্ত্বাদর্শ প্রচারিত হয়েছিল তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে চিত্র-রচনার প্রেরণা। সম্যক বা অনুত্তর জ্ঞানের স্বরূপ আর মানবকল্যাণে তার যথাযথ প্রয়োগ কীর্তিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সে কারণে তাত্ত্বিক মূল্যের উপরেও স্বীকৃতি পেয়েছে গ্রন্থের ধর্মীয় গুরুত্ব। যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে এই গ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যার্জনের অপরিহার্য অঙ্গ-রূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের অনেক পুঁথিতেই এই ধরনের পাঠ ও আবৃত্তির সাক্ষ্য বর্তমান। গ্রন্থের অনেক স্থানে এই গ্রন্থের অনুলিপি-প্রস্তুতি একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, আর ধূপ, দীপ, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি সহকারে এই গ্রন্থের অনুলিপির অর্চনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বারবার। এই প্রকার পূজার্চনার সাক্ষ্যও আমাদের অনেক পুঁথিতেই বিদ্যমান। বহুল-প্রচারিত এই মত ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কালক্রমে গ্রন্থের ধর্মীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবে। আর এই বিশ্বাস স্বতঃই বদ্ধমূল হয়েছিল যে গ্রন্থের অনুলিপির প্রস্তুতি ও দান আর গ্রন্থের পাঠ, আবৃত্তি, পূজার্চনা ইত্যাদি অনুত্তর জ্ঞানলাভের সহায়ক ও সমার্থক। এই বিশ্বাসই বারবার উচ্চারিত হয়েছে প্রতিটি পুঁথির দান-পুষ্পিকা অংশে উদ্ধৃত এই বাক্যে 'যদত্র পুণ্যং



তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানবাপ্তয় ইতি'। আমাদের একখানি পুঁথিতে (গ তালিকার ১২ নং) এই আদর্শ আর বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে সুন্দর একটি শ্লোকের মাধ্যমে—

'যাবন্ ন লভতে লোকঃ কৃৎস্নাং বোধিমনুত্তরাম্।
তাবৎ তিষ্ঠত্বীয়ং কীর্তিঃ সম্বোধিফলদায়িনী॥

আগেই বলা হয়েছে এই ধরনের দান ধর্মদানরূপে স্বীকৃত। দাতা তাঁর পুণ্যকর্মের ফল বিলেয়ে দিয়েছেন সর্বসাধারণের হিতার্থে।

এই মতাদর্শের সঙ্গে কালক্রমে যুক্ত হল তান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাস। প্রজ্ঞাপারমিতা-শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল শূন্যতা-বোধ আর আত্মার এই স্তরে উপনীত হবার উপায়সমূহ। তন্ত্র মতে, এই শূন্যতা-বোধ উপলব্ধি হলে বীজমন্ত্রের মাধ্যমে শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য দেব-দেবীর আবির্ভাব সম্ভব। এইসব দেব-দেবী কল্পনার জগতের সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁদের কর্ম ও গুণ অনুসারে সাধকের মানসে রূপ পরিগ্রহ করেন। সাধক এই দৃশ্যমান রূপ ধ্যান করে এই দেব-দেবীর শক্তি আয়ত্ত করতে পারেন, আর এইভাবে অনুত্তর জ্ঞানলাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। এই ধারণা ও ও বিশ্বাস তন্ত্রাদর্শ হতে উদ্ভূত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পাল যুগে এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়। আর এই মন্ত্রময় ক্রিয়াকাণ্ডবহুল বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ বিকাশের কালেই প্রস্তুত হয়েছিল আমাদের এই সব পুঁথিচিত্র। এই প্রসঙ্গে তারনাথের একটি উক্তির উল্লেখও প্রয়োজন বলে মনে হয়। উক্তিটি আনুমানিক এক হাজার খ্রীষ্টাব্দের বাগীশ্বরকীর্তি নামক পূর্ব-ভারতের এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য সম্পর্কে। তারনাথ বলছেন—এই আচার্য

তাঁর সমস্ত সন্দেহ নিরসনে সমর্থ হয়েছিলেন ভগবতী তারার কৃপায়, আর দেবীর কৃপা তিনি লাভ করেছিলেন অবিরত ধ্যানযোগে দেবীর ভাগবতী তনু আর তাঁর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে। বাগীশ্বরকীর্তি সম্বন্ধে তারনাথের এই উক্তি তখনকার কালের ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এই ধর্মবিশ্বাসেই নিহিত আছে এ সব পুঁথিচিত্রের তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা। এই ধর্মবিশ্বাসেই আমরা পাই এই ধরনের পুঁথিচিত্রের সার্থকতা। এই সব চিত্র প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পুঁথিতে আঁকা হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, একটি সচেতন মনোভাব আর বিশ্বাসের প্রেরণায়। পুঁথি নির্বিশেষে, গ্রন্থ নির্বিশেষে, এ সব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল ধ্যানযোগ-সংসিদ্ধির উপায় রূপে, পূর্ণ তথাগত জ্ঞানের পথে অগ্রসর হবার সহায় হিসেবে। তন্ত্র-প্রবর্তিত ধারণা আর বিশ্বাস অনুযায়ী পরাভক্তি আর সাধনা তথতা-জ্ঞানলাভের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হত। এই ভক্তি ও সাধনার বিবর্ধনই ছিল এ সব চিত্রাঙ্কনের মুখ্য উদ্দেশ্য। একমাত্র এই দৃষ্টিতেই বোঝা যায় কেন এইসব পুঁথিতে ভগবান বুদ্ধের মহান জীবনের ঘটনাবলী আর বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ বারবার চিত্রিত হয়েছে।

পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের পুঁথিতে আমরা স্বভাবতঃই পাই এই মণ্ডলীর পঞ্চ মহা-দেবীর রূপ। আর বিভিন্ন ধারণী গ্রন্থের পুঁথিতে পাওয়া যায় ধারণী-বর্ণিত সেই সব দেব-দেবীর চিত্র। পঞ্চরক্ষার পুঁথিতে আবার কখনো কখনো (যথা ক তালিকার ৫ নং) পঞ্চ মহাদেবী ছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্রও দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলো বৌদ্ধ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর এই সব গ্রন্থের পুঁথিচিত্রের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই এই সব দেব-দেবীর সান্নিধ্যে উপনীত হতে সাধকদের সহায়তা করা। এই পর্যায়ের গ্রন্থের সঙ্গে চিত্রের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই নিহিত আছে প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথির চিত্রেও। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এ সব পুঁথির চিত্র নিছক বা যথেচ্ছ অলঙ্করণ নয়। এই চিত্রাঙ্কনের পেছনে আছে বৌদ্ধ তন্ত্রাদর্শের সচেতন স্বীকৃতি। একটা স্পষ্ট অভিপ্রায় ও মানস প্ররণা জুগিয়েছিল এইসব চিত্রের। তখনকার বৌদ্ধধর্মের পরি-



প্রেক্ষিতে পুঁথি আর তার চিত্রে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই, একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই।

। ২ ।

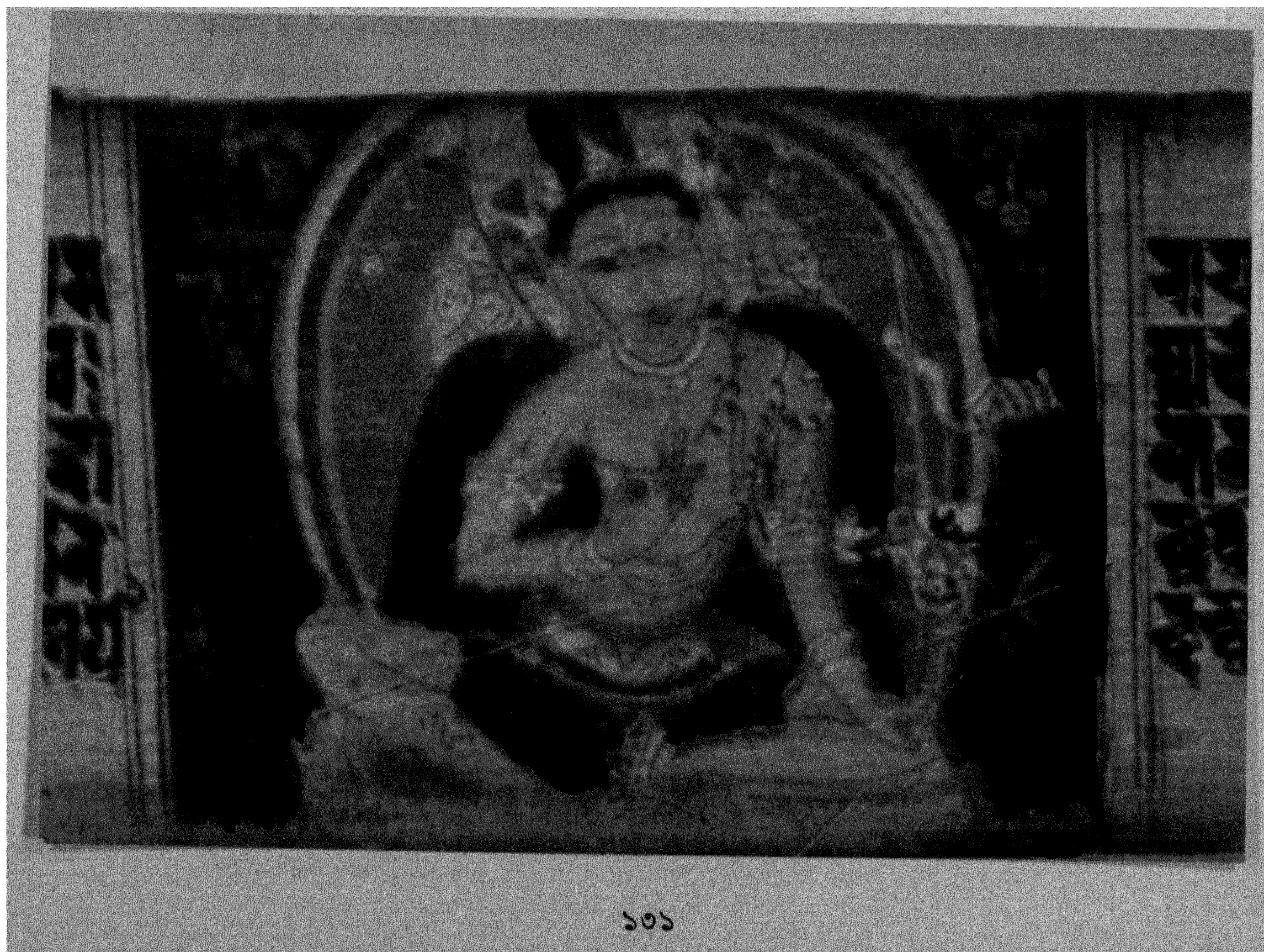
পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে দুজন বরেন্দ্রবাসী শিল্পী, ধীমান আর তাঁর পুত্র বীতপাল, পূর্ব-ভারতের শিল্পকলায় যে ধারার প্রবর্তন করেন তা পূর্ব-ভারতীয় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। এই রীতির প্রকাশ দেখা যায় দুটি ক্ষেত্রে—একটি ভাস্কর্যে ও ধাতুমূর্তি নির্মাণে আর একটি চিত্রকলায়। পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন এখন দেখা যায় পাল যুগের পুঁথিচিত্রে। সে কারণে এই চিত্ররীতি পাল যুগের চিত্রকলা নামেও অভিহিত হতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই চিত্রকলার নিদর্শন-সম্ভার আর তাদের আনুমানিক কালপঞ্জী আলোচিত হয়েছে আগের একটি অনুচ্ছেদে। আর একটি অনুচ্ছেদে এই চিত্রের আঙ্গিক প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের শুরুতে পুঁথি ও চিত্রের মধ্যে আপাতবিরোধ সম্পর্কে যে সমস্যা সে সমস্যা নিরসনেরও প্রয়াস করা হয়েছে। এখন এই চিত্ররীতির সামগ্রিক আলোচনা ও বিচারের প্রচেষ্টা নিরর্থক হবে না বলে মনে করা যায়।

তারনাথের বিবরণ অনুসারে এই রীতির প্রবর্তন হয়েছিল ধর্মপালদেব ও দেবপালদেবের সময়ে, খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে। এই চিত্রকলার নিদর্শন এখন অবশিষ্ট আছে দশম শতকের শেষপাদ থেকে। অর্থাৎ এই চিত্ররীতির প্রায় দুশো বছরের প্রারম্ভ-পর্বের কোন নিদর্শনই এখন বিদ্যমান নাই। সুতরাং এ চিত্ররীতির প্রারম্ভ-পর্বের ইতিহাস বা সে সম্পর্কে আলোচনা নির্ভর করে অনেকটা অনুমানের ওপর। অবশ্য এই অনুমানের দৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি আছে। অধুনা বিদ্যমান নিদর্শন-দৃষ্টে

প্রণিধান করা যায় যে চিত্রগুলো তখনকার শিলা ও ধাতুমূর্তির সমগোত্রীয়—এমন কি চিত্রে মূর্তি-শিল্পের ছায়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব-ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমপ্রকাশ ও সাদৃশ্যের কারণ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আদি পাল যুগের, অর্থাৎ অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যবর্তী, ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন, বিদ্যমান আছে প্রচুর। ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন অবলম্বনে আর তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সমগোত্রীয় পাল যুগের চিত্রকলার আদিপর্ব সম্বন্ধে কিছু সঙ্গত সিদ্ধান্ত করা চলে, যে সিদ্ধান্তের অযথার্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

পালযুগের ভাস্কর্য, বা পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের উদ্ভব হয় গুপ্তকালীন মার্গ রীতির পূর্ব-ভারতীয় ধারা থেকে। গ্রন্থান্তরে বর্ণিত* বর্তমান লেখকের এই মত স্বীকৃত হয়েছে সুধীমহলে। আর এই মার্গ রীতির ছাপ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান দেখা যায় পালযুগের ভাস্কর্য শিল্পে অনেকদিন ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয় যে পাল যুগের চিত্রকলা বা পূর্ব-ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রারম্ভপটে বর্তমান ছিল গুপ্ত-কালীন মার্গ রীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। চিত্রশিল্পে এই মার্গরীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় গুপ্ত-সংস্কৃতিকালীন অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি গুহার চিত্রাবলীতে। এই মার্গ রীতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল সেকথাও জানা যায় সমকালীন সিতাভিঞ্জির ভিত্তি চিত্র থেকে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের একটি বিবরণের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই পরিব্রাজক পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক) কিছুদিন বাস করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তাঁর সময়ে তাম্রলিপ্ত ছিল পুঁথিচিত্র-প্রস্তুতির একটি সুপরিচিত কেন্দ্র। অবশ্য তাম্রলিপ্তের এই পুঁথিচিত্রের কোন নিদর্শন এখন আর বিদ্য-

*S. K. Saraswati, *A Survey of Indian Sculpture,* 2nd. ed. New Delhi, 1975.



মান নাই। তবুও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পুঁথির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগে যে চিত্ররীতি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল সে রীতি মার্গ রীতি থেকে অভিন্ন। মার্গ রীতির প্রসার ছিল সর্বব্যাপী—যেমন ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনই চিত্রকলার ক্ষেত্রে। ফা-হিয়েন-বর্ণিত পূর্বাঞ্চলের পুঁথির চিত্ররীতি মার্গরীতির সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল এমন মনে করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়। ভাস্কর্য শিল্পে মার্গ রীতির পূর্বাঞ্চলে প্রসারের একাধিক নিদর্শন মগধ, বঙ্গদেশ ও কামরূপের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। চিত্রে এই নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি সত্য। তবুও ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা চলে যে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে মার্গ চিত্ররীতি একেবারে অপরিচিত ছিল না। সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ভাবেই করা চলে যে ধর্মপালদেব ও দেবপালদেবের সময়ে পূর্ব-ভারতীয় বা পাল যুগের চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল মার্গ চিত্র-রীতি আশ্রয় করে। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনও পাওয়া যায় আমাদের জানা নিদর্শন পর্যায়ের সব চাইতে পুরোনো পুঁথির চিত্রে। এই পুঁথির চিত্রে মার্গ রীতির চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান। মার্গ রীতি-আশ্রয়ী না হলে দশম শতকের শেষ ভাগের আমাদের এই পুঁথির চিত্রে মার্গ রীতির প্রসাদ-গুণের বিদ্যমানতা সম্ভব হত না।

ভারত শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় মার্গ রীতি আর মধ্যযুগীয় রীতি আর তাদের আদর্শের প্রায়শঃই উল্লেখ করা হয়। পাল যুগের চিত্রকলার অনুশীলনে এই সব সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় গোড়াতেই। পণ্ডিতদের মতে গুপ্ত সংস্কৃতি-কালীন অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি গুহার চিত্রাবলীতেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট প্রকাশ, আর এই প্রকাশেই দেখা যায় মার্গরীতির আদর্শের পরিণতি ও বৈভব। ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও এই পরিণতি দেখা যায় গুপ্ত সংস্কৃতির যুগেই; তার প্রমাণ তখনকার কালের অসংখ্য ভাস্কর্য নিদর্শন, আর এই নিদর্শন পাওয়া গেছে উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, সব অঞ্চল

থেকেই। কী চিত্রে, কী ভাস্কর্যে ভারত শিল্পের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় প্রতিটি নিদর্শনের ব্যঞ্জনাগুণে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হয়েছে যেমন বর্তনাময় আকার-সৃষ্টিতে তেমনি পারিপার্শ্বিক রচনায়। সুললিত, তরঙ্গায়িত রেখা বেষ্টন করে আছে কম তনু আর এক সূত্রে গ্রথিত করেছে তার নতোন্নত অংশ সুন্দর, সুসমঞ্জস ও সুসম্বন্ধ রূপে। ভাব প্রতিফলিত হয়েছে অর্থবহ নানা ভঙ্গী, আসন ও মুদ্রার মাধ্যমে। উপরন্তু, শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি আর কৃতিকুশলতার গুণে প্রতিটি রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে এক অপার্থিব দীপ্তি, যে দীপ্তির আভাস আগের বা পরের শিল্পকর্মে দুর্লভ। গুপ্ত সংস্কৃতি-কালীন ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প এইসব গুণ বৈভবে সমানভাবে সমৃদ্ধ। চিত্রকর্মে ছেদহীন, সুপরিসর, তরঙ্গায়িত রেখা সৌষ্ঠবের উপরে দেখা যায় রঙের ব্যঞ্জনা। নানা রঙের বিভিন্ন ছায়ের স্নিগ্ধ ও সুসম ব্যবহারে বর্তনাময় আকৃতির প্রতিফলন, শ্যামোজ্জ্বলতার সমন্বয়ে প্রতিকৃতির পূর্ণ উদ্ভাসন। সমস্ত গুণগত বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ দেখা যায় একমাত্র গুপ্ত সংস্কৃতি-কালীন শিল্পে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকর্মে। সে কারণে তখনকার শিল্পরীতি মার্গরীতি নামে পরিচিত হবার যোগ্য। এই রীতি, কী চিত্রে কী ভাস্কর্যে, বর্তনার ব্যঞ্জনায় একান্তভাবে ভাস্বর।

পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগে, শিল্পকর্মে ব্যঞ্জনাময় বর্তনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে দেখা যায়। মধ্যযুগের ভারত-শিল্প রেখা-প্রধান, রেখাসর্বস্বও বলা যায়। কিন্তু এই যুগের শিল্পে রেখাবিন্যাসে মার্গরীতির আদর্শের বা মানসের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। মার্গরীতির রেখার মুখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বর্তনা-সৃষ্টিতে। কিন্তু মধ্যযুগের শিল্পে রেখার টানে নেই সে সুললিত সাবলীল ভঙ্গী, নেই সে ছেদহীন কমনীয় ভাব, যা ছিল মার্গরীতির শিল্পে বর্তনা-সৃষ্টির প্রধান অঙ্গ। মধ্যযুগীয় শিল্পের দৃঢ়বন্ধ, ভঙ্গশীল, কুটিল রেখা হারিয়েছে মার্গরীতির রেখার প্রসাদ-গুণ। মধ্যযুগের চিত্রকর্মেও রেখার টান সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। তাছাড়া রঙের বিন্যাসে বর্তনা-সৃষ্টির আভাসও অতিমাত্রায় ক্ষীণ। এই দুই যুগের শিল্পাদর্শ দুটি পৃথক শিল্প-মানসের দ্যোতক বলে পণ্ডিতেরা মত



প্রকাশ করেছেন—তাঁদের মতে মার্গরীতির শিল্প বর্তনাময় (plastic) মধ্যযুগের শিল্প রেখাসর্বস্ব (linear),— দুটি পৃথক শিল্প-দৃষ্টির অবদান। এই রেখাসর্বস্ব রীতি মধ্যযুগের শিল্পকর্মে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। সে কারণে এই রীতি মধ্যযুগীয় রীতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মধ্যযুগীয় এই আদর্শের অনুপ্রবেশ ভারতীয় শিল্পে একই ভাবে বা একই মাত্রায় ঘটেনি। ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যশিল্পে, মধ্যযুগীয় আদর্শের ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। দ্বিমাত্রিক চিত্রকর্মে অবশ্য এই রেখাসর্বস্ব রীতির প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী স্পষ্ট ও প্রতীয়মান। মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এ যুগের রেখাসর্বস্ব আদর্শের প্রসারে ও প্রভাবে মার্গরীতির বর্তনা-ব্যঞ্জনাময় শিল্পদৃষ্টির ক্রমবিলোপের কাহিনী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

চিত্রকর্মে মধ্য যুগীয় এই আদর্শের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায় পশ্চিম-ভারতীয় পুঁথিচিত্রে। পশ্চিম-ভারতীয় চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল, প্রধানতঃ জৈন ধর্মের আওতায়। এই পুঁথিচিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে।*

পাল যুগের ভাস্কর্য গড়ে উঠেছিল মার্গরীতির ভাস্কর্যের দৃঢ়ভিত্তির উপর। শিল্পকর্মে বর্তনার ঔচিত্য সম্পর্কে শিল্পীদের সচেতনতাও ছিল অনেক বেশী প্রখর। এই কারণে মধ্যযুগীয় আদর্শ পাল ভাস্কর্যকলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলা চলে। পাল যুগের চিত্রকর্ম সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা যায় না। এই চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছে মার্গরীতির চিত্রাদর্শ হতে—এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিমাত্রিক চিত্রকর্মে মধ্যযুগীয় রেখাসর্বস্ব রীতির ছাপ ও প্রভাব স্বভাবতঃই অনুভূত হয় বেশী। এ কারণে মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রভাব থেকে একে-

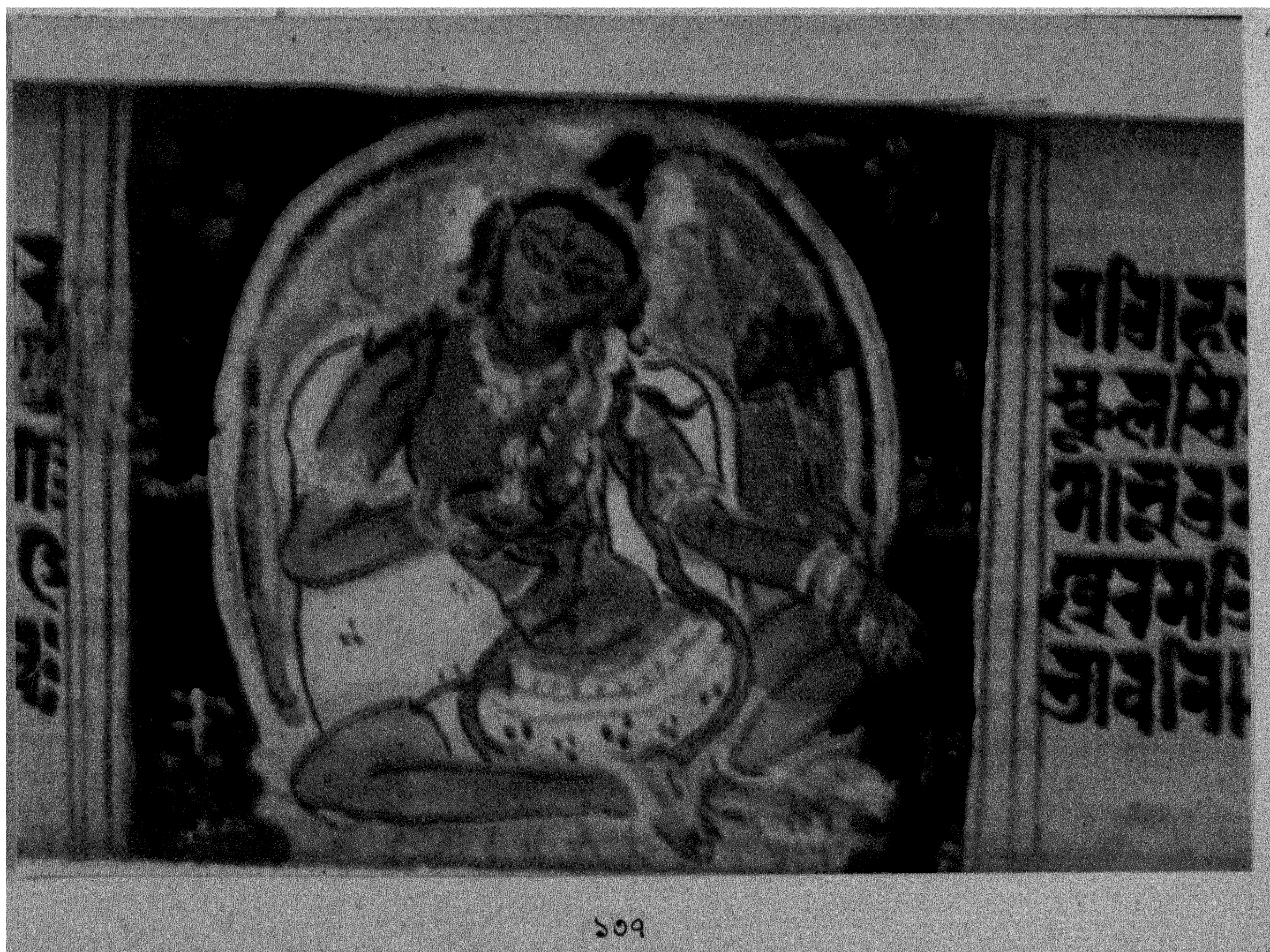
*পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন 'ওঘ নির্যুক্তি'র একখানি চিত্রিত পুঁথি লেখা হয়েছিল ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

বারে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি পাল যুগের চিত্রকলার। আবার এটাও লক্ষণীয় যে পাল চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় আদর্শ পুরোপুরি স্বীকৃতি কোনদিনই পায়নি, যেমন পেয়েছে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলায়। আমাদের জানা সমস্ত পুঁথির চিত্রবিচারে দেখা যাবে যে দ্বাদশ শতকের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদের চিত্রকরদের মনে একটা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে—আর সে দ্বন্দ্ব মার্গরীতি ও মধ্যযুগীয় রীতির পৃথক আদর্শের মধ্যে। মার্গরীতির আদর্শ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হলেও সে আদর্শ দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি বর্তমান ছিল দেখা যায়। আবার মধ্যযুগীয় আদর্শের যেটুকু অনুপ্রবেশ পাল চিত্রকলায় ঘটেছে তাও যেন স্বীকৃতি পেয়েছে অনেকটা দ্বিধার সঙ্গে। পাল চিত্রকলায় মার্গরীতির আদর্শের এই দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব প্রকারান্তরে এই চিত্রকলার শুরুতে মার্গরীতির সচেতন স্বীকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত বিশেষভাবে সমর্থন করে।

। ৩ ।

মার্গরীতি আর মধ্যযুগীয় রীতির দুই ভিন্নাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদের মনে এই যে দ্বিধা ও দোলায়মানতা দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই আমাদের জানা সব চাইতে প্রাচীন পুঁথির চিত্রেই। এ পুঁথির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আগেই।

পুঁথিখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার অনুলিপি, এখন রক্ষিত আছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে (No. G 4713)। পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে (ক তালিকার ১ নং)। চারখানি পত্রে, প্রত্যেক খানিতে তিনটে করে, মোট বারখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে। প্রতিটি পাতায় দু পাশে আছে বুদ্ধের জীবনচিত্র, আর মাঝখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ। কাঠের পাটার চিত্র অবশ্য পরবর্তীকালের।



কালের প্রকোপে পত্রের চিত্রগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। তবুও সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় চিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা একখানি চিত্রের (চিত্র নং ৪, ৫১) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সামগ্রিক-ভাবে এই পুঁথির চিত্ররীতির পরিচায়ক হিসেবে। এই চিত্রে লুম্বিনী বনে ভগবান বুদ্ধের জন্মকাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর রচনাভঙ্গীটি (motif) সুপরিচিত, এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অঙ্কন-রীতিতে অবশ্য কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ মহোদয়ার মন্তব্যের উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অনবদ্য ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি উপস্থাপিত করেছেন ঃ

"There is much modelling in colour and also of the sinuous lines which increase or decrease in thickness in accordance with the surging roundness which they outline or accompany. This is most evident in the left arm of Mayadevi's sister, while her face is modelled with highlights in the same summary manner which is to be found in the modelling itself in its plastic version. This somewhat rigid treatment occurs as in the case of this miniature along with subtler transitions, as in the modelling of the face etc. of Mayadevi, and if this treatment in either application belongs to the family of Ajanta paintings, that of Mayadevi's face stands nearer to the type of modelling in Ajanta at its height, whereas that of the sister's face is nearer to the stagnating treatment which is noticeable especially in Ellora..." (*JISOA.* Vol. I. No. 2).

এই উদ্ধৃতির সারানুবাদ নীচে দেওয়া হল ঃ

"এই চিত্রে বর্তনার ব্যঞ্জনা দেখা যায় প্রচুর। রেখা-বর্তনা ও বর্ণ-বর্তনা দুই আছে এই চিত্রে। বর্ণ-বর্তনায় মায়া দেবীর অবয়বে, বিশেষ করে তাঁর মুখমণ্ডলে, রঙের স্নিগ্ধ ও সুসম ছায়ে বর্তনা-প্রকাশ অজন্তা চিত্রের গৌরবময় যুগের কথা স্বতঃই স্মরণ করিয়ে দেয়। নতোন্নত অংশের বিভাজনে রেখার সাবলীল বিন্যাসও বেশ

স্পষ্ট। মায়াদেবীর ভগিনীর চিত্রে রঙের বর্তনা কিছু অস্পষ্ট। তবুও রঙ ও রেখার বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে চিত্রখানি গুহা-চিত্রাবলীর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। রঙের বর্তনার অস্পষ্টতা ইলোরার চিত্রে লক্ষ করা যায়—মায়াদেবীর ভগিনীর চিত্রে দেখা যায় সেই আদর্শের অভিব্যক্তি।"

মনে রাখা প্রয়োজন, রঙের বর্তনায় এই অস্পষ্টতা থেকেই মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের সূচনা হয়েছে। দুই আদর্শের স্বীকৃতি সম্বন্ধে যে দ্বিধাবোধ তা অধুনা বর্তমান সর্বপ্রথম পুঁথির চিত্রেই দেখা যায়।

আমাদের এই পুঁথিখানির চিত্র (চিত্র নং ৪, ৫) কৃতিকৌশলে স্পষ্টত আর প্রধানত মার্গরীতি-আশ্রিত বলেই ধারণা করা সংগত। প্রথম মহীপালদেব-নামাঙ্কিত অন্য দুখানি পুঁথির তারিখ যথাক্রমে রাজ্যাঙ্ক ৭, আর রাজ্যাঙ্ক ২৭ (ক তালিকার ২ ও ৩ নং)। এ দুখানি পুঁথির চিত্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের একখানি চিত্রিত পুঁথির কথা আমরা আগেই বলেছি (ক তালিকার ৪ নং)। এ পুঁথির চিত্রের পরীক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথম মহীপালদেবের পুত্র ছিলেন নয়পালদেব। পিতার পর তিনি পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজার চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের দুখানি চিত্রিত পুঁথি এখন বর্তমান আছে (ক তালিকার ৫ ও ৬ নং)। প্রথমখানি পঞ্চরক্ষার অনুলিপি—এখন রক্ষিত আছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে (No. Add 1688) । প্রতি-পত্রে তিনখানি করে বারখানি পত্রে মোট ছত্রিশখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে। রক্ষা-মণ্ডলীর পঞ্চ মহাদেবীর চিত্র (চিত্র নং ৬, ৭) ছাড়াও অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, তারা (চিত্র নং ৮), মানুষী বুদ্ধ, (চিত্র নং ১০), যোগিনী (চিত্র নং ৯) প্রভৃতির রূপও অঙ্কিত আছে এই পুঁথিতে। এই পুঁথির চিত্রে বর্তনা-সৃষ্টির প্রয়াস যেমন লক্ষ



করা যায় রেখার সাবলীলতায় তেমনি দেখা যায় রঙের সুসম ছায়ে। অবশ্য সুললিত, কমনীয়, তরঙ্গায়িত রেখাই বর্তনা-ব্যঞ্জনার মুখ্য মাধ্যম—ব্যঞ্জনা প্রধানতঃ প্রতিফলিত হয়েছে রেখা-বিন্যাসেই। রঙের আস্তরণ কিছুটা পাতলা হয়েছে, কিন্তু মধ্য যুগীয় আদর্শ অনুযায়ী সমমাত্রিক নয়, ছায়-রহিতও নয়। রঙের ব্যবহারে আছে শ্যামোজ্জ্বলতার সুষ্ঠু আভাস। রেখা ও রঙের সুসম ব্যবহারে চিত্রের সৌকর্য ও মাধুর্য পরিস্ফুট হয়েছে এই পুঁথিতে। নয়পালদেবের তারিখ-যুক্ত আর একখানি চিত্রিত পুঁথি এখন আছে Los Angeles County Museum-এ। এটি একখানি ধারণী গ্রন্থের খণ্ডিত অনুলিপি—শেষ পত্রসহ মাত্র দুখানি পত্র এখন বর্তমান। রামজীব নামে এক নেপালী উপাসক পুঁথিখানি দান করেছিলেন; পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে। দুখানি পত্রে আছে ছয়খানি চিত্র। চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা। কৃতি-সৌকর্যে এই পুঁথির চিত্র প্রথম পুঁথিখানির চিত্রের অনুরূপ। মার্গরীতির আদর্শ ও মানস সম্পর্কে নয়পালদেবের আমলের চিত্রকরেরা বেশ সচেতন ছিলেন। মধ্যযুগীয় আদর্শের স্বীকৃতি, রেখায় বা রঙে, একালের চিত্রে দেখা যায় না। তবে রঙের পাতলা আস্তরণের ফলে বর্ণ-বর্তনার ব্যঞ্জনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগীয় আদর্শের অনুপ্রবেশ হয়তো আসন্ন।

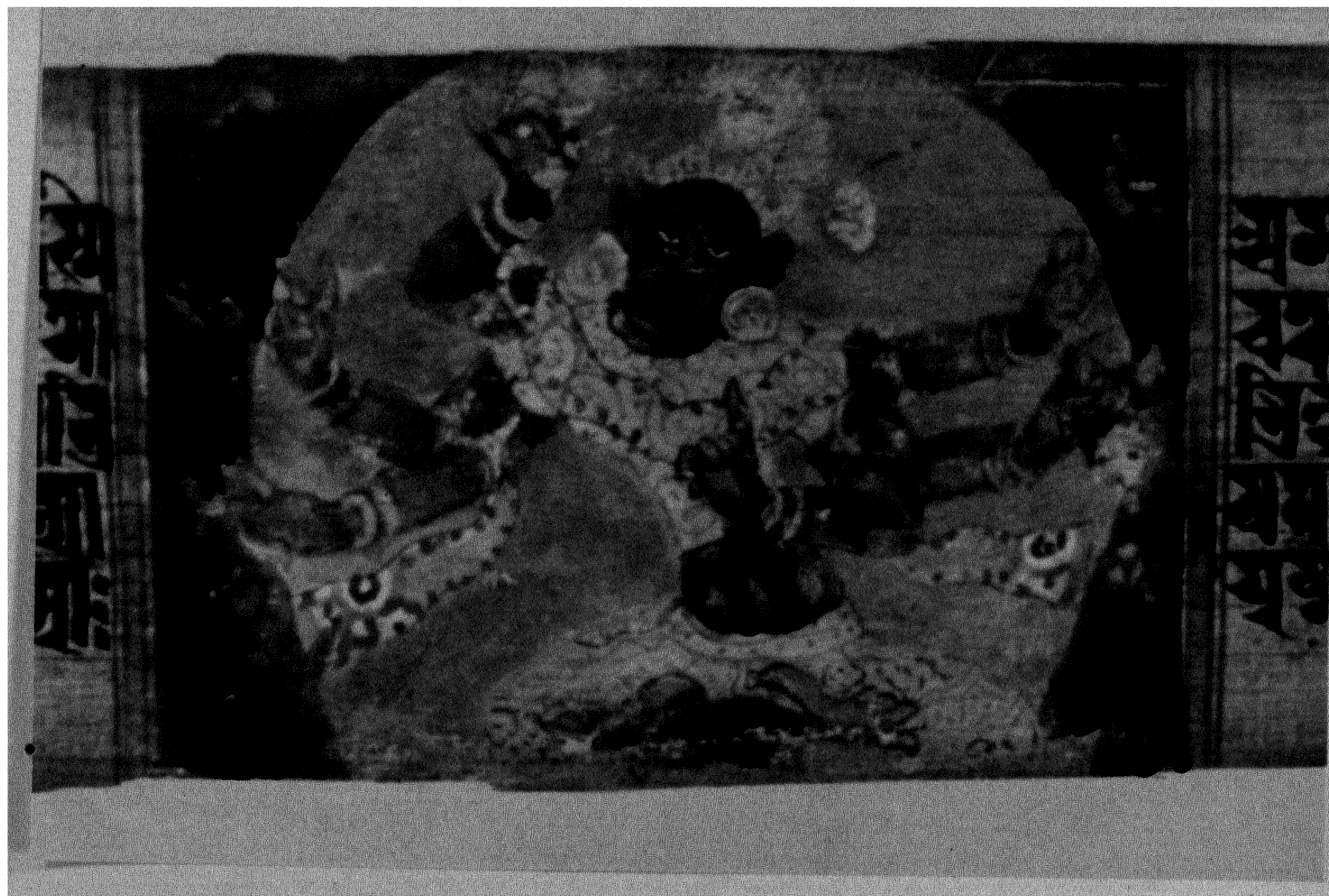
মধ্যযুগীয় আদর্শের দৃঢ় পদক্ষেপ প্রথম লক্ষ করা যায় দ্বিতীয় মহীপালদেবের তারিখ-যুক্ত একখানি পুঁথিতে। এ পুঁথির চিত্রের কথা আমরা আগেই বলেছি। পুঁথিখানি (ক তালিকার ৭ নং) এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (No. Add 1464) । এখানি প্রস্তুত হয়েছিল মহীপাল নামে এক রাজার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে। চিত্র-বিচারে পুঁথিখানি দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়কালের বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সঙ্গত কারণেই। দ্বিতীয় মহীপালদেব ছিলেন নয়পালদেবের পৌত্র। পুঁথিখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার অনুলিপি পাঁচখানি পত্রে পনেরখানি চিত্র আছে এই পুঁথিতে, আর আছে সমকালের দুখানি চিত্রিত পাটা (চিত্র নং ৩)। পুঁথির পাতায় চিত্র আছে বুদ্ধ জীবনের ঘটনাবলীর আর বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ। বুদ্ধ

জীবনের ঘটনাবলীর চিত্র-বিন্যাসে নতুন রীতির সঙ্কেত মেলে এই পুঁথির চিত্রে—তার আলোচনা পরে করা হবে।

আগেই বলা হয়েছে এই পুঁথির চিত্রগুলি একটি পৃথক আদর্শের একটি ভিন্ন শিল্পমানসের পরিচয় দেয় (চিত্র নং ১১, ১২, ১৩)। রঙের পাতলা আস্তরণ নয়পালদেবের সময়কার পুঁথির চিত্রে লক্ষিত হয়। তবে তখনও রঙ একেবারে বর্তনা-ব্যঞ্জনাবিহীন নয়। মহীপালদেবের এই পুঁথিতে রঙ শুধু পাতলাই নয়, একেবারে সমমাত্রিক ও ছায়-রহিত। বর্ণ-বর্তনার সামান্য আভাসও এই পুঁথির চিত্রে মেলে না, তা ছাড়াও রেখা-বিন্যাসে দেখা যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ছেদহীন, সাবলীল, তরঙ্গায়িত রেখার পরিবর্তে এ পুঁথির চিত্রে আছে কঠিন, ভঙ্গশীল, কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখার সমাবেশ. আর এই ধরনের রেখার সমাবেশে বর্তনা-ব্যঞ্জনাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বিশেষভাবে। রেখা-বর্তনার কোন ইঙ্গিতই এই পুঁথির চিত্রের রেখা-বিন্যাসে লক্ষ করা যায় না। চিত্রে বর্তনা-গুণ সম্পর্কে এই বিরূপতা এ পুঁথির চিত্রে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান; সেটি একটি পৃথক শিল্প-দৃষ্টির সূচক। আর এই পৃথক শিল্প-দৃষ্টি মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। পাল যুগের চিত্রকলায় তার আবির্ভাব স্পষ্টভাবে প্রথম লক্ষ করা যায় এই পুঁথির চিত্রে।

রেখা-বিন্যাসের ব্যাপারে শিল্পাদর্শ ও শিল্প-দৃষ্টি পরিবর্তনের ফলে দণ্ডায়মান ভঙ্গী পরিণত হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকারে। Kramrisch এই আকৃতির নাম দিয়েছেন 'sickle shape'। এই রূপ একান্ত অস্বাভাবিক। ভারত শিল্পের চিরাচরিত সাবলীলতা গুণ বর্তমান পুঁথি চিত্রের এই ভঙ্গীতে দেখা যায় না। সবার উপরে আছে পার্শ্বগত ভঙ্গীতে একটি চোখের দেহগণ্ডীর বাইরে উদ্গত অতিক্রমণ—এটি একেবারেই অস্বাভাবিক।

মহীপালদেবের এই পুঁথিখানির চিত্রের সব বৈশিষ্ট্যই সৃষ্ট হয়েছে দেখা যায় মধ্যযুগীয় শিল্প-দৃষ্টি ও শিল্প-মানসের অনুসরণে। মধ্যযুগীয় আদর্শের এই



পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রথম মহীপালদেব বা নয়পালদেবের সময়কার পুঁথির চিত্রে দেখা যায় না। সে সব চিত্রের রীতিবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল মার্গচিত্রের রীতির আদর্শ ও মানস আশ্রয় করে, রেখা ও রঙের ব্যঞ্জনা-ময় বর্তনা যার প্রধান প্রসাদ-গুণ। এই দুই পৃথক আদর্শ আর দৃষ্টির একত্রাবস্থান আপাতবিরোধী বলে মনে করাই সঙ্গত হবে। মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের এই পুঁথিখানি মহীপালদেব-নামাঙ্কিত ষষ্ঠ, সপ্তম আর সপ্তবিংশতিতম রাজ্যাঙ্কের তিনখানি পুঁথি আর নয়পালদেবের আমলের দুখানি পুঁথির চাইতে পরবর্তীকালের বলে আমরা মনে করি। এসব কারণেই বর্তমান পুঁথিখানি দ্বিতীয় মহীপালদেবের আমলের আর একাদশ শতকের সত্তরের দশকের সমকালের বলে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। এই পুঁথির চিত্রের এসব বৈশিষ্ট্যগুলো একাদশ শতকের পাল চিত্রকলায় আকস্মিক বলে মনে হতে পারে, কারণ এগুলো পাল চিত্রকলায় সাধারণভাবে সম্মতি পায় পরের শতকের মধ্যভাগের সমসময়ে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাল চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় আদর্শের এ সব লক্ষণগুলোর ব্যাপারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া কয়েকখানি তাম্রপট্টে খোদাই রেখাঙ্কনের তুলনা করা হয়েছে। এই তাম্রপট্টগুলোর সব চাইতে পুরোনো-খানির তারিখ ১১১৮ শকাব্দ বা ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই ধরনের রেখাঙ্কনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। বিচ্ছিন্ন, কুটিল রেখা, দেহগণ্ডীর বাইরে অতিক্রান্ত চোখ ইত্যাদি এই রেখাঙ্কনগুলোতে বিশেষভাবে স্পষ্ট। এগুলো মধ্যযুগীয় আদর্শের বিশিষ্ট লক্ষণ সন্দেহ নেই। তবুও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাম্রপটে খোদাই রেখাঙ্কনে এ সব লক্ষণ কিছুটা বিশেষ খোদাই-বিধি প্রয়োগের ফলেও এসে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় মহীপালদেবের আমলের পুঁথির চিত্রে মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের যে অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায় পাল যুগের চিত্রকলায় তার সচেতন স্বীকৃতি আসে আরও

অনেককাল পরে। দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা রামপালদেব পাল রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর নামাঙ্কিত রাজ্যাঙ্কের অন্যূন সাতখানি চিত্রসংযুক্ত পুঁথি (ক তালিকার ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং) এখন বর্তমান আছে (রাজ্যাঙ্ক ২, ৯, ১৫, ১৮, ৩৬, ৩৯ ও ৫৩)। দুখানি চিত্রিত পুঁথি আছে বর্ম-বংশীয় হরিবর্মদেবের অষ্টম ও ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কযুক্ত (ক তালিকার ১৫ ও ১৬ নং)। হরিবর্মদেব পাল সম্রাট রামপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে—এ বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি। রামপালদেব অন্তত তিপ্পান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন। একাদশ শতকের সত্তরের দশকে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর রাজত্বকালের মধ্যে কম করে নয়খানি (সাতখানি তাঁর রাজ্যাঙ্কের, আর দুখানি হরিবর্মদেবের) চিত্র-সংযুক্ত পুঁথি বিদ্যমান আছে। চিত্র-সংখ্যাও এগুলোর নেহাত কম নয়। সব পুঁথির চিত্রেই অঙ্কনরীতির একটা মৌল সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পুঁথিগুলো পাল চিত্রকলার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, হরি-বর্মদেবের শাসন তখনকার বঙ্গের বাইরে বিস্তৃত ছিলনা—তাঁর তারিখ-যুক্ত দুখানি পুঁথিই বর্তমান বাংলাদেশেই প্রস্তুত হয়েছিল।

রামপালদেবের সময়ের সব পুঁথির চিত্রেই উন্নত মানের অঙ্কনসৌকর্য লক্ষ করা যায়। রেখা ও রঙের বিন্যাসে আছে মার্গরীতির আদর্শের সুস্পষ্ট ছাপ—চিত্রগুলো প্রথম মহীপালদেব ও নয়পালদেবের সময়ের পুঁথিচিত্রের সমগোত্রীয়। এক কথায় বলা যায় রামপালদেবের সময়েও পাল চিত্রকলায় পূর্ব ধারা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ের পুঁথির চিত্রে মধ্যযুগীয় রীত্যাদর্শের যে ছাপ স্পষ্ট, রামপাল-দেবের আমলের কোন পুঁথির চিত্রেই সেটা লক্ষ করা যায় না। দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ে মধ্যযুগীয় আদর্শের এই প্রকাশ, পালচিত্রকলার মধ্যপর্বের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রম বলেই স্বীকার করতে হবে। রামপালদেবের সময়ের পুঁথির চিত্র এই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।



রামপালদেবের আমলের পুঁথির চিত্রে ব্যঞ্জনাময় বর্তনা যেমন দেখা যায় রেখার সৌষ্ঠবে, তেমনি আছে রঙের বিন্যাসে। ছেদহীন, তরঙ্গায়িত, সাবলীল রেখা যেমন দেহের নতোন্নত অংশ একসূত্রে গ্রথিত করেছে, তেমনি পরিস্ফুটিত করেছে বর তনু ও তার বর্তুলতা। এই রেখা সৌষ্ঠবের সঙ্গে মার্গরীতির রেখা বিন্যাসের পার্থক্য খুবই অল্প। বর্তনার ব্যঞ্জনা প্রধানত রেখা সৌষ্ঠবের উপরই আশ্রিত। রঙের আস্তরণ, নয়পালদেবের পুঁথিচিত্রের মত, কিছুটা পাতলা হয়েছে; তবুও বিভিন্ন স্নিগ্ধ ও সুসম ছায়ে শ্যামোজ্জ্বলতার আভাসও পরিষ্কার দেখা যায় রামপালদেবের সময়ের পুঁথির চিত্রে। সীমারেখার সংলগ্ন অংশে ভিন্ন রঙের ছায়ের ব্যবহারে বর্তুলতার ইঙ্গিতও স্পষ্ট। রামপালদেবের সময়ের দু-একখানি পুঁথির চিত্র কালের প্রকোপে ও অযত্ন সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কতকটা অস্পষ্ট হয়েছে, তবুও যে একই লক্ষণাক্রান্ত সে ধারণা করতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

রামপালদেবের নবম (ক তালিকার ৯ নং—চিত্র নং ১৪, ১৫, ১৬, ১৭) পঞ্চদশ (ক তালিকার ১০ নং—চিত্র নং ৪৬, ৫২) আর ষট্‌ত্রিংশত্তম (ক তালিকার ১২ নং—চিত্র নং ৫৩, ৫৪) রাজ্যাঙ্কের পুঁথির চিত্র একালের চিত্রকলার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। রেখা ও রঙের সমন্বয়ে বর্তনা-সৃষ্টির সচেতন আর সার্থক প্রয়াস দেখা যায় এই পুঁথিগুলোর চিত্রে। এই বর্তনা-বোধ মার্গরীতির শিল্প-মানসের উপর আশ্রিত; আর এই ধারা অব্যাহতভাবে বিদ্যমান দেখা যায় পাল যুগের চিত্রকলার অধুনা বর্তমান সব চাইতে পুরোনো নিদর্শন থেকেই। মধ্যযুগীয় আদর্শের যে ছাপ দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ের পুঁথিচিত্রে লক্ষ্য করা যায়, রামপালদেবের আমলের পুঁথিচিত্রে আমরা দেখি তার পূর্ণ অস্বীকৃতি। পালযুগের চিত্ররীতি মধ্যযুগীয় আদর্শের কাছে সহজে নতি স্বীকার করেনি একথা আগেই বলা হয়েছে। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে পাল যুগের চিত্ররীতির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের (ক তালিকার ১০ নং) পুঁথিখানি লেখা হয়েছিল নালন্দা মহাবিহারে আর অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কের (ক তালিকার ১১ নং) পুঁথি আপনক মহাবিহারে। নালন্দা মহাবিহারের নাম ও খ্যাতি সকলেরই জানা আছে। আপনক মহাবিহারের নাম, এই পুঁথি ছাড়া, আমরা পেয়েছি কয়েকখানি মূর্তির লিপিতে। কিন্তু এই মহাবিহারের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। বিহারটি যে পূর্বভারতেই অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নই।

আপনক মহাবিহারের এই পুঁথিখানি দান করেছিলেন মলয়দেশ-বিনির্গত শাক্যভিক্ষু স্থবির পূর্ণচন্দ্র আর তাঁর শিষ্য স্থবির ত্রৈলোক্যচন্দ্র। লিপি ও চিত্র-বিচারে জানা যায় যে ছবিসহ পুঁথিখানি প্রস্তুত হয়েছিল পূর্ব-ভারতীয় রীতির অনুসরণে। ভিন্‌দেশী দাতার আনুকূল্যে পুঁথিখানি লেখা ও আঁকা হয়েছিল পূর্ব-ভারতীয় লিপিকর আর চিত্রকর কর্তৃক। নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের একখানি পুঁথি (ক তালিকার ৬ নং) দান করেছিলেন রামজীব নামে একজন নেপালী উপাসক—একথা আমরা আগেই বলেছি। মনে রাখা প্রয়োজন ভিন্নদেশীয় দাতা তাঁর দেশ হতে কোন বস্তু সাধারণতঃ সঙ্গে আনতেন না অন্য অঞ্চলের তীর্থ-স্থানে ধর্মদানের উদ্দেশ্যে। সেখানেই তিনি দানের বস্তুটি সংগ্রহ করতেন বা প্রস্তুত করিয়ে নিতেন। এটাই ছিল তখনকার কালে প্রচলিত প্রথা। মূর্তিদান সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ প্রথার সন্ধান পাই—তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। ১৯৩০ খৃীষ্টাব্দে গয়ার কাছে কুরকিহার নামে এক জায়গায় প্রচুর ধাতুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এগুলো এখন পাটনার সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। অনেকগুলি মূর্তিতে দান সম্পর্কীয় লিপি দেখা যায়। এই লিপি পাঠে জানা যায় কতকগুলি মূর্তি দান করেছিলেন কাঞ্চী-নিবাসী বিভিন্ন দাতা। মূর্তিগুলো সবই পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্য রীতির অন্তর্গত; আর দান সম্পর্কে লিপিও লেখা হয়েছিল পূর্ব-ভারতীয় অক্ষরেই। সন্দেহ নাই সুদূর



দক্ষিণ হতে পুণ্যার্থীরা পূর্ব-ভারতে তীর্থ ভ্রমণে এসে পূর্ব-ভারতের শিল্প দ্রব্যই সংগ্রহ করেছিলেন বা পূর্ব-ভারতের শিল্পী নিয়োগ করেছিলেন, আপন আপন ধর্মদানের উদ্দেশ্যে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে—পুনরুক্তি-দোষ ও বাহুল্য ভয়ে সে প্রয়াস করা হল না।

রামপালদেবের নামাঙ্কিত চিত্র-সংযুক্ত পুঁথি পাওয়া গেছে তাঁর দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্ক থেকে ত্রিপঞ্চাশত্তম রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত। হরিবর্মদেবের অষ্টম ও ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথি দুখানি (ক তালিকার ১৫ ও ১৬ নং) রামপালদেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। আগেই বলা হয়েছে এই দুখানি পুঁথি বর্তমান বাংলাদেশেই তৈরী হয়েছিল। তারিখ-পুষ্পিকা থেকে জানা যায় অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানি লেখা হয়েছিল মহন্তা বিহারে। মহন্তা বিহারের অবস্থান আমাদের এখন জানা নাই, তবে বিহারটি যে বাংলাদেশেই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ পুঁথিতে এখন পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ২২ খানি বিচ্ছিন্ন পত্র অবশিষ্ট আছে—প্রতিটি পত্র চিত্রখচিত (চিত্র নং ৪৭)। মধ্যস্থলে দেখা যায় দেব-দেবী ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতিকৃতি, দুধারে পুঁথি বাঁধবার ছিদ্রস্থানে আছে জ্যামিতিক অলঙ্করণ, আর আর দুই প্রান্তে স্তূপের ছবি। পাতার ছিদ্রস্থলে জ্যামিতিক নকশা রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানিতে (ক তালিকার ১০ নং) দেখা যায়। হরিবর্মদেবের এই পুঁথিখানিতে দেবদেবীর চিত্র আঁকা হয়েছে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী। রেখার টানে সাবলীলতার অভাব নেই, যদিও অঙ্কন হয়েছে কিছুটা স্থূল ধরনের। রঙের আস্তরণ পাতলা আর প্রায় ছায়-রহিত। তবুও এ-পুঁথির চিত্রের (চিত্র নং ১৮, ১৯), রীতি রামপালদেবের আমলের অন্যান্য পুঁথিচিত্রের রীতি থেকে পৃথক নয়। অবশ্য কৃতিসৌকর্যে হরিবর্মদেবের পুঁথির চিত্র কিছুটা নিম্নমানের। তাঁর ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথির চিত্র সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়।

। ৪ ।

মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শ ও শিল্প-মানসের প্রকাশ দ্বিতীয় মহীপালদেবের আমলের পুঁথির চিত্রে স্পষ্ট দেখা গেলেও এ আদর্শের স্বীকৃতি রামপালদেবের সময়ের পুঁথিচিত্রে পাওয়া যায় না—তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই আদর্শ সম্বন্ধে পূর্ব-ভারতীয় শিল্পীদের মনে একটা দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের ভাব আমাদের পুঁথিচিত্রে লক্ষ করা যায়, শুরু হতে রামপালদেবের রাজত্বের শেষকাল অবধি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্য সমসময়ে মধ্যযুগীয় আদর্শের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমাদের এই চিত্ররীতির সমকালীন পশ্চিম-ভারতীয় চিত্ররীতি মধ্যযুগীয় শিল্প-মানসের পূর্ণ পরিণতি বলেই বিভিন্ন পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। পাল যুগের চিত্রকলার আদি ও মধ্য পর্বে এই আদর্শ ও মানসের সচেতন স্বীকৃতি লক্ষ করা যায় না। ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু একটি ক্ষেত্রে—দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ের পুঁথির চিত্রে। রামপালদেবের আমলের পুঁথিচিত্রের সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় আদর্শের এই প্রকাশ আকস্মিক বলে মনে হতে পারে। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে দ্বিতীয় মহীপালদেবের সময়ের পুঁথির চিত্রে মধ্যযুগীয় আদর্শের আগ্রাসী অভিযানের সূচনা হয়েছে। মার্গরীতির আদর্শের প্রতি অধিক অনুরাগের দরুন পাল চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় দৃষ্টি প্রসারে বিলম্ব ঘটেছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দৃষ্টি বা আদর্শের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। রামপালদেবের পর মুসলমান অধিকার স্থাপনের কাল তক পাল যুগের চিত্রকলার অন্ত্য পর্ব বলে মনে করা চলে। এই অন্ত্য পর্বেই লক্ষ করা যায় পূর্ব ভারতের চিত্ররীতিতে মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের ক্রমপ্রসার। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা অবধি পাল যুগের চিত্রকলা মার্গরীতির দৃষ্টি ও আদর্শ হতে একেবারে বিচ্যুত হয়নি। এই চিত্রকলার ধারা গড়ে উঠেছিল মার্গরীতির আদর্শে আর অনুপ্রেরণায়। মধ্যযুগীয় আদর্শের ক্রম-



প্রসারেও পুরোনো আদর্শের একেবারে বিলুপ্তি হয়নি বা তার বিস্মৃতি ঘটেনি।

এই অন্ত্য পর্বে আমরা পাই নয়খানি চিত্র-সংযুক্ত পুঁথি—তৃতীয় গোপালদেবের আমলের দুটি (রাজ্যাঙ্ক ৪ ও ১৫), মদনপালদেবের সময়ের একখানি (রাজসম্বৎ ১৭); গোবিন্দপালদেব-নামাঙ্কিত সম্বতের চারখানি (৯, ১৮, ২২ ও ৩২), লক্ষ্মণ-সেনগত-সম্বতের চতুর্থ বৎসরের একখানি (ক তালিকার ২০ নং) আর গোমীন্দ্রপাল নামে এক রাজার চতুর্থ সম্বৎসরের একখানি। এই পুঁথিগুলি (ক তালিকার ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং) দ্বাদশ শতকের ত্রিশের দশক হতে শেষ দশকের মধ্যবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত হয়েছিল। এর মধ্যে আবার পাঁচখানি পুঁথির (মদনপালদেবের একখানি আর গোবিন্দপালের চারখানি) সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা যায়—এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

অন্ত্য পর্বের এই পুঁথিগুলির চিত্রে মধ্যযুগীয় দৃষ্টি ও মানসের প্রসার দেখা যায় ভঙ্গশীল, কুটিল রেখাবিন্যাসে আর রঙের সমমাত্রিক ছায়াহীন ব্যবহারে। সাধারণ-ভাবে বলা চলে এই সব পুঁথির চিত্রে রেখা বা রঙের বর্তনাগুণের কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। দণ্ডায়মান মূর্তির অর্ধচন্দ্রাকার রূপ, পার্শ্বগত ভঙ্গীতে একটি চোখের দেহ-গণ্ডীর বাইরে অতিক্রমণ, এই পর্বের পাল চিত্রকলার সাধারণ লক্ষণরূপে পরিচিত করা যায়। চিত্রাঙ্কনেও লক্ষিত হয় মৌল চারুতার অভাব যার ফলে চিত্রগুলি পরিণত হয়েছে ছন্দোবিহীন নকশায় (প্যাটার্ন)। এই সব চিত্রে মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রভাব আর অস্পষ্ট নয়, বরং পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান বলা যায়।

অন্ত্য পর্বের উল্লেখের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিত্রকলার পর্ববিভাগ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির সূচনা হয় খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে, আমরা আগেই বলেছি, মার্গরীতির আদর্শ আর শিল্প-মানস আশ্রয় করে। এই প্রারম্ভ পর্বের প্রায় দুশো বছর কালের কোন নিদর্শনই এখন বিদ্যমান নেই। এই কালকেই আমরা এই চিত্রকলার আদি পর্ব বলে অভিহিত করতে

পারি। দশম শতকের শেষ পাদ হতে নিদর্শন সমূহের প্রাচুর্য দেখা যায়। নিদর্শন-গত প্রমাণে জানা যায় প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল মার্গরীতির আদর্শ ও মানস অনুসরণে। আদি পর্বের চিত্ররীতিও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল অনুমান করা চলে। প্রথম মহীপালদেবের (দশম শতকের শেষ পাদ) সময় হতে রামপালদেবের কাল অবধি এই দেড়শ বছর এই চিত্রকলার মধ্য পর্ব বলে অভিহিত হতে পারে। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হতে এই চিত্রকলার অন্ত্য পর্ব গণনা করা যায়। এই পর্বে মধ্যযুগীয় আদর্শের ক্রমপ্রসারে পাল চিত্রকলায় মার্গ-রীতির শিল্প-মানস ক্রমশ ম্লান ও সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। তবুও মার্গরীতির ধারা দ্বাদশ শতকের শেষাবধি ক্ষীয়মান অবস্থায় বিদ্যমান দেখা যায়—এই পর্বের পুঁথির চিত্র-বিচারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অন্ত্য পর্বের পাল চিত্রকলার উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলি এই পর্বের সব পুঁথির চিত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান; আর এই লক্ষণগুলি মধ্যযুগীয় আদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিচয় দেয় নিশ্চিত ভাবে। অবস্থা-দৃষ্টে মনে হতে পারে যে মধ্যযুগীয় আদর্শের আগ্রাসী অভিযানে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলায় মার্গ চিত্ররীতির বিনষ্টি হয়তো আসন্ন। তবুও দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই চিত্রকলায় মার্গরীতি আশ্রিত ধারার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা এই পর্বের কয়েকখানি পুঁথির চিত্রের উল্লেখ করতে পারি। একখানি মদনপালদেবের ১৭ রাজসম্বতের (ক তালিকার ১৯ নং), চারখানি গোবিন্দপালদেব-নামাঙ্কিত সম্বতের (ক তালিকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং), আর একখানি গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সংবৎসরের (ক তালিকার ২৫ নং)।

প্রথমখানি পঞ্চরক্ষার একখানি খণ্ডিত অনুলিপি—শেষ পত্র সহ দুখানি পত্র মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। ১১৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়েছিল। দুখানি পত্রে আছে দুটি রক্ষা মহাদেবীর চিত্র। রেখার সুললিত বিন্যাসে আর ছায়যুক্ত রঙের



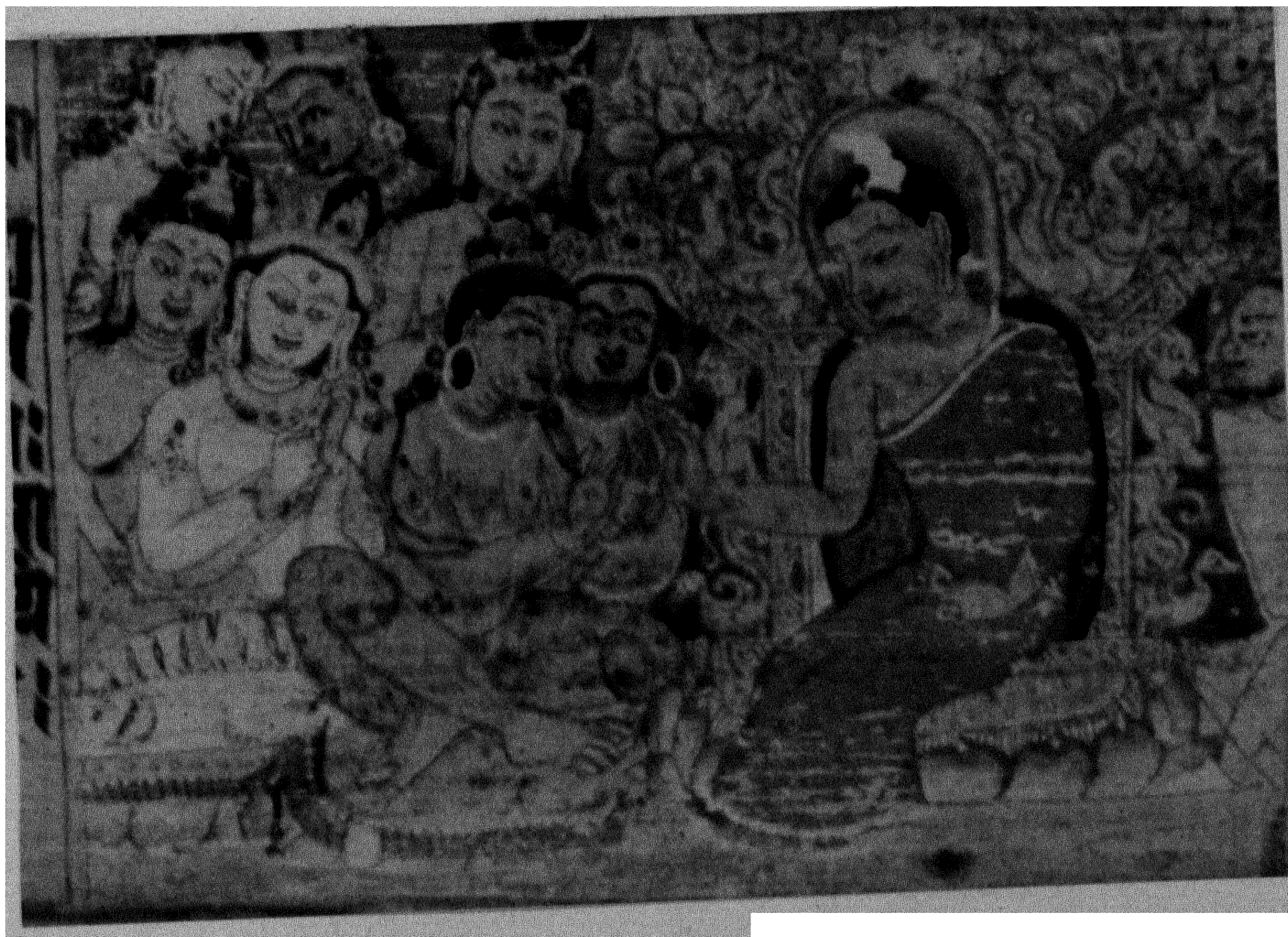
ব্যবহারে মার্গরীতির বর্তনা-গুণের আভাস দুখানি চিত্রেই স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান।

গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত সম্বতের চারখানি চিত্রিত পুঁথির মধ্যে তিনখানি পরীক্ষার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

আরও একখানি পুঁথির (ক তালিকার ২১ নং) চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মু্যজিয়মের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ রবার্ট স্কেলটন মহাশয়ের সৌজন্যে। এই প্রতিলিপির সাহায্যে এ-পুঁথির চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। পুঁথিখানি এখন আছে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থশালায়। প্রস্তুত হয়েছিল গোবিন্দপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে (খ্রীষ্টাব্দ ১১৭০-৭১)। পাতাগুলি জীর্ণ হলেও পাতার ছবিগুলো মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে। পাটা দুখানি মনে হয় পরবর্তী কালের; তার ছবিও কালের প্রকোপে প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলীর চিত্র ছাড়াও পাতায় আছে অনেক দেব-দেবীর রূপ। বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলীর চিত্রণে আছে মধ্যযুগীয় রীত্যাদর্শের ছাপ কুটিল, ভঙ্গশীল রেখায়, পার্শ্বগত ভঙ্গীতে উদ্গত নেত্রে আর রঙের ছায়-হীন একমাত্রিক ব্যবহারে। ভগবান বুদ্ধের জন্ম আর অন্যান্য কাহিনীর চিত্রে এই সব লক্ষণ বেশ স্পষ্ট (চিত্র নং ২০)। পক্ষান্তরে দেব-দেবীর চিত্রে মার্গরীতির অভিব্যক্তি দেখা যায় সাবলীল রেখা-বিন্যাসে আর সুসম ছায়-যুক্ত রঙের ব্যঞ্জনায়। ফলে ছবিগুলোর বর্তনা-গুণ বেশ স্পষ্ট আর তা মধ্য পর্বের পালচিত্রকলার সব লক্ষণই স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এই পুঁথির কুরুকুল্লা (চিত্র নং ২৪), মহাশ্রী তারা (চিত্র নং ২১), মহাসাহস্রপ্রমর্দনী (চিত্র নং ২২) প্রভৃতি দেবী আর কয়েকটি দেবতার (চিত্র নং ২৩) চিত্র। এই অন্ত্য পর্বেও পাল চিত্রকলায় দুটি ভিন্নাদর্শী মানসের সহাবস্থান এই চিত্রকলার একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের অন্যান্য পুঁথির চিত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। গোবিন্দপাল-দেবের ১৮ সম্বতের পুঁথির (ক তালিকার ২২ নং) মাত্র শেষ পত্র এখন অবশিষ্ট। সে

পাতায় আছে তিনটি তান্ত্রিক দেব-দেবীর চিত্র। চিত্রগুলো অযত্ন সংরক্ষণ ব্যবস্থার দরুন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে (চিত্র নং ২৫, ২৬)। তবুও রেখার লালিত্যে ছবিগুলো এককালে যে ভাস্বর ছিল তা বুঝতে কোন কষ্টই হয় না। পুঁথি-খানি তৈরী হয়েছিল ১১৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত আর দুখানি (ক তালিকার ২৩ ও ২৪ নং) পুঁথির চিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই আছে—তৈরী হয়েছিল যথাক্রমে ১১৮৩-৮৪ ও ১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমখানি পঞ্চরক্ষার অনুলিপি, আর দ্বিতীয়খানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার। প্রথমখানিতে দেখা যায় পাঁচটি রক্ষা মহাদেবীর চিত্র, আর দ্বিতীয়খানিতে আছে বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা-বলীর সঙ্গে চারটি দেব-দেবীর চিত্র। এ পুঁথিখানি আবিষ্কৃত হয়েছে অতি সম্প্রতি। বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলীর চিত্রণে দেখা যায় মধ্যযুগীয় আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি—এই আদর্শের সব লক্ষণই অল্পবিস্তর দেখা যায় এই সব চিত্রে। আবার দেব-দেবীর চিত্রণে আমরা দেখি মার্গরীতির বর্তনা-গুণ রেখা আর রঙের বিন্যাসে। উদাহরণ রূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি এই পুঁথির সিংহনাদ লোকেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা আর রক্ষা দেবীর চিত্র। পঞ্চরক্ষার পুঁথির রক্ষা দেবীদের চিত্রেও লক্ষ করা যায় অনু-রূপ ব্যঞ্জনা। গোমীন্দ্রপালদেবের পুঁথির চিত্র প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।

গোমীন্দ্রপালদেবের সময়ের পুঁথিখানি (ক তালিকার ২৫ নং) অস্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অনুলিপি—দ্বাদশ শতকের অন্তিম ভাগে প্রস্তুত হয়েছিল; এমনও হতে পারে এই পুঁথিখানি গোবিন্দপালের ১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথির আগেই তৈরী হয়েছিল। এই পুঁথিতে চারখানি পত্রে আছে বারখানি চিত্র। আর আছে দুখানি চিত্রিত পাটা। পত্রের বারখানি চিত্রের মধ্যে আটখানিতে বর্ণিত হয়েছে বুদ্ধ-জীবনের আটটি প্রধান ঘটনা, আর চারখানিতে আছে চারটি বৌদ্ধ দেবতার রূপ। ভগবান বুদ্ধের জীবন সম্পর্কীয় আটখানি চিত্রে রেখা আর রঙের বিন্যাসে দেখা যায় মধ্যযুগীয় আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। হ্রস্ব, ছিন্ন আর কুটিল রেখা এবং



পাতলা, সমমাত্রিক ও ছায়াহীন রঙ মধ্যযুগীয় চিত্রাদর্শের এই লক্ষণ দুটি এই আটখানি চিত্রে প্রকট ভাবে বিদ্যমান, যেমন দেখা যায় এই পর্বের অন্যান্য পুঁথির চিত্রে। বর্তনার আভাসমাত্র লক্ষিত হয় না রেখা আর রঙের ব্যবহারে। তাছাড়া দণ্ডায়মান ভঙ্গীর অর্ধচন্দ্রাকার রূপ আর পার্শ্বগত ভঙ্গীতে উদ্গত চোখ, মধ্যযুগীয় আদর্শের পরিচিত লক্ষণ, এই পুঁথির চিত্রে আর এ পর্বের অন্যান্য পুঁথির চিত্রে সমভাবে বিদ্যমান (চিত্র নং ২৭)।

তুলনায় এই পুঁথিতে দেবতাদের চারখানি চিত্রে (চিত্র নং ২৮, ২৯, ৩০) লক্ষ করা যায় এক ভিন্ন শিল্প-মানসের পরিচয়, যে মানস গড়ে উঠেছিল মার্গরীতির বর্তনা-ব্যঞ্জনাময় আদর্শের অনুসরণে পূর্ব-ভারতীয় বা পাল চিত্রকলায়। সুললিত ও তরঙ্গায়িত অবিচ্ছিন্ন রেখা-বিন্যাসে আর সুসম ও স্নিগ্ধ ছায়ের রঙের ব্যবহারে রেখা-বর্তনা ও বর্ণ-বর্তনার যে আভাস লক্ষিত হয় এই সব চিত্রে, তা রামপালদেবের আমলের চিত্রের ব্যঞ্জনা থেকে কোনক্রমেই ন্যূন নয়। রঙের আস্তরণ পাতলা হয়েছে সত্য, তবুও রঙের বিন্যাসে শ্যামোজ্জ্বলতার ইঙ্গিতও স্পষ্ট এসব চিত্রে। অরপচন মঞ্জুশ্রীর (চিত্র নং ৩১) একখানি চিত্র আছে এই চারখানি চিত্রের মধ্যে—রঙ তার অনেক জায়গায় মুছে গেছে, ফলে রেখা-সৌষ্ঠবের প্রসাদ-গুণ স্পষ্ট হয়েছে বিশেষভাবে। রেখা আর রঙের ব্যবহারে একই আদর্শের অভিব্যক্তি দেখা যায় এই পুঁথির দুখানি চিত্রিত পাটাতেও, বিশেষ করে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রখানিতে। এই সব চিত্রের আর গোবিন্দপালদেবের ১১৭০-৭১ ও ১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথির দেব-দেবীর চিত্রের সাক্ষ্যগত প্রমাণে একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অন্ত্য পর্বে মধ্যযুগীয় রীত্যাদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও পাল যুগের চিত্রকলা মার্গরীতির ধারা থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়নি। দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ব-ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত, মার্গরীতির আদর্শ ও মানস বিস্মৃত হয়নি।

গোমীন্দ্রপালদেবের সময়ের পুঁথিখানিতে চিত্রের বিষয়বস্তু বিন্যাসে নির্দিষ্ট

নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। প্রতি পত্রে তিনখানি করে চিত্র, এই নিয়মের অধীন চিত্রিত পুঁথিতে চার পত্রে সাধারণত দেখা যায় প্রতিপত্রে দুই পাশে ভগবান বুদ্ধের দুটি জীবন-চিত্র, আর মধ্যস্থলে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পুঁথিখানির (ক তালিকার ১ নং) চিত্র-বিন্যাসের উল্লেখ করতে পারি। নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের খণ্ডিত পুঁথির (ক তালিকার ৬ নং) চিত্র-বিন্যাসে অনুরূপ নিয়মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথিতে (ক তালিকার ১০ নং) চিত্র-বিন্যাসের একই নিয়ম অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। এই নিয়মই অনুসৃত হয়েছে দেখা যায় গোবিন্দপালের ১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথিতে (ক তালিকার ২৪ নং)। মধ্য পর্বের পাল চিত্রকলায় একমাত্র দ্বিতীয় মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথিতে (ক তালিকার ৭ নং) এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রথম লক্ষিত হয়। এই পুঁথিতে তিনখানি পত্রে পরপর বর্ণিত হয়েছে বুদ্ধ-জীবনের আটটি মুখ্য ঘটনা—দুই পত্রে তিনটি করে ছয়টি, আর তৃতীয় পত্রে দুটি। এই পত্রের অবশিষ্ট চিত্রে আর অতিরিক্ত দুটি পত্রের ছয়খানি চিত্রে আঁকা হয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ। সাধারণ নিয়মের এই ব্যতিক্রম এই পুঁথিখানিকে প্রকারান্তরে প্রথম মহীপালদেবের পরবর্তী কালের বলে চিহ্নিত করে। গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসরের পুঁথিখানিতেও দেখা যায় সাধারণ নিয়মের এই ব্যতিক্রম। এ পুঁথিতে চারখানি চিত্রিত পত্র আছে। তার মধ্যে তিনখানি পত্রে আছে পর পর বুদ্ধ-জীবনের আটটি চিত্র। তৃতীয় পত্রের শেষ চিত্রে আর চতুর্থ পত্রের তিনখানি চিত্রে দেখা যায় অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয়, অরপচন মঞ্জুশ্রী আর বজ্রপাণির রূপ। আরও দেখা যায়, বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবিন্যাসে নির্দিষ্ট পারম্পর্যও লঙ্ঘিত হয়েছে এ পুঁথির চিত্র-বিন্যাসে।

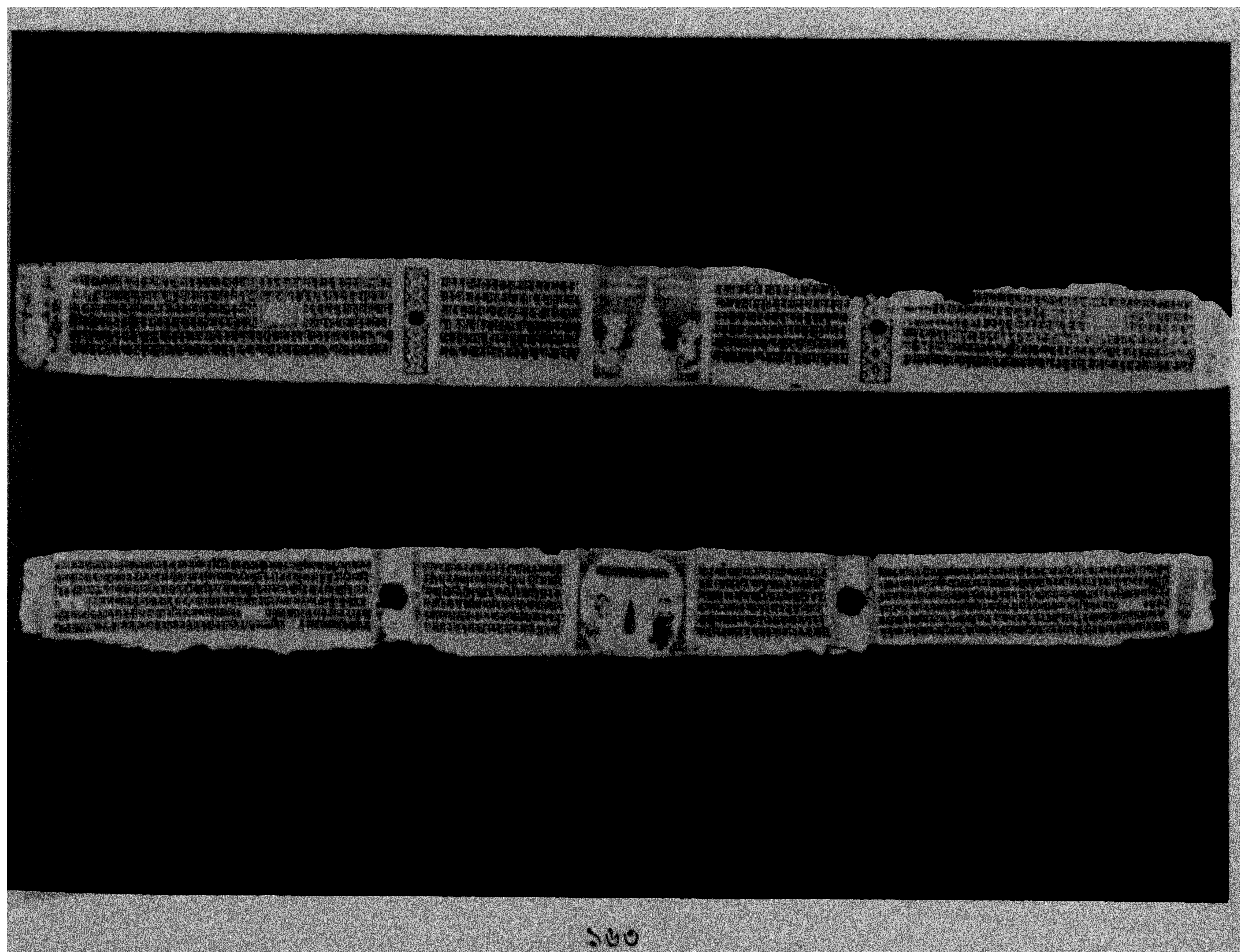
অন্ত্য পর্বের পুঁথির চিত্র প্রসঙ্গে লক্ষ্মণসেন-গতসম্বতের চতুর্থ বর্ষের পুঁথি-খানির (ক তালিকার ২০ নং) চিত্র-বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই পুঁথিতে চিত্র আঁকা হয়েছে দেখা যায় কোন পত্রে লেখার সোজা, কোন পত্রে লেখার



বিপরীতে অর্থাৎ উল্টোভাবে (চিত্র নং ৩২)। এই ধরনের চিত্র-বিন্যাস বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী শহরের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত একখানি তারিখ-বিহীন সমকালীন পুঁথিতেও লক্ষ করা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই চিত্রগুলি তান্ত্রিক দেব-দেবীদের রূপাঙ্কন, তার মধ্যে বহুপদ-বিশিষ্ট দেব-দেবীদের চিত্রও দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করতে পারেন লেখার বিপরীতে চিত্রাঙ্কন হয়তো চিত্রকরদের নিরক্ষরতা আর অজ্ঞানতার পরিচায়ক। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এই অভাবনীয় রকমের চিত্র-বিন্যাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় দেখা যায় এইরূপ দুই পত্রের একখানিতে চিত্রিত হয়েছে দেবতাদের রূপ, অপর পত্রে দেবীদের। সংলগ্নতা অনুসারে দুটি পত্র মিলে হয়েছে একটি একক সত্তা। এইভাবে দুটি পত্র পরপর সাজালে দেবতা ও দেবীর চিত্র মিলে সৃষ্ট হয় তান্ত্রিক বিশ্বাস প্রণোদিত দেব-দেবীর সম্মিলিত যুগনদ্ধ রূপ। কারণ্ড ব্যূহের ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পুঁথিতেও (ক তালিকার ২৮ নং) দেখা যায় একই ধরনের চিত্র-বিন্যাস। অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা নয়, একটি সুচিন্তিত কল্পনার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় এই ধরনের চিত্র-বিন্যাসে।

। ৫ ।

দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামধর্মী বিজেতাদের আগ্রাসী অভিযানে পূর্ব-ভারতে ভিন্নধর্মী বিদেশীদের শাসনের সূত্রপাত হয়। কাল-ক্রমে, একমাত্র আসাম ছাড়া সমগ্র পূর্ব-ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়। ভিন্ন-ধর্মী বিদেশী শাসনের যুগে পূর্ব আদর্শ আর সংস্কৃতির ধারা ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয় নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই। শুরু হয় পূর্ব-ভারতীয় বা পাল চিত্রকলার অবক্ষয় পর্ব। পাল যুগের প্রারম্ভে মার্গরীতির আদর্শ আর মানসের অনুসরণে যে চিত্ররীতির উদ্ভব হয়েছিল পূর্ব-ভারতে মধ্যযুগীয় দৃষ্টির প্রসার সত্ত্বেও দ্বাদশ শতকের অন্ত্যভাগ পর্যন্ত তার পূর্বধারার বিলুপ্তি ঘটেনি—এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। দুটি

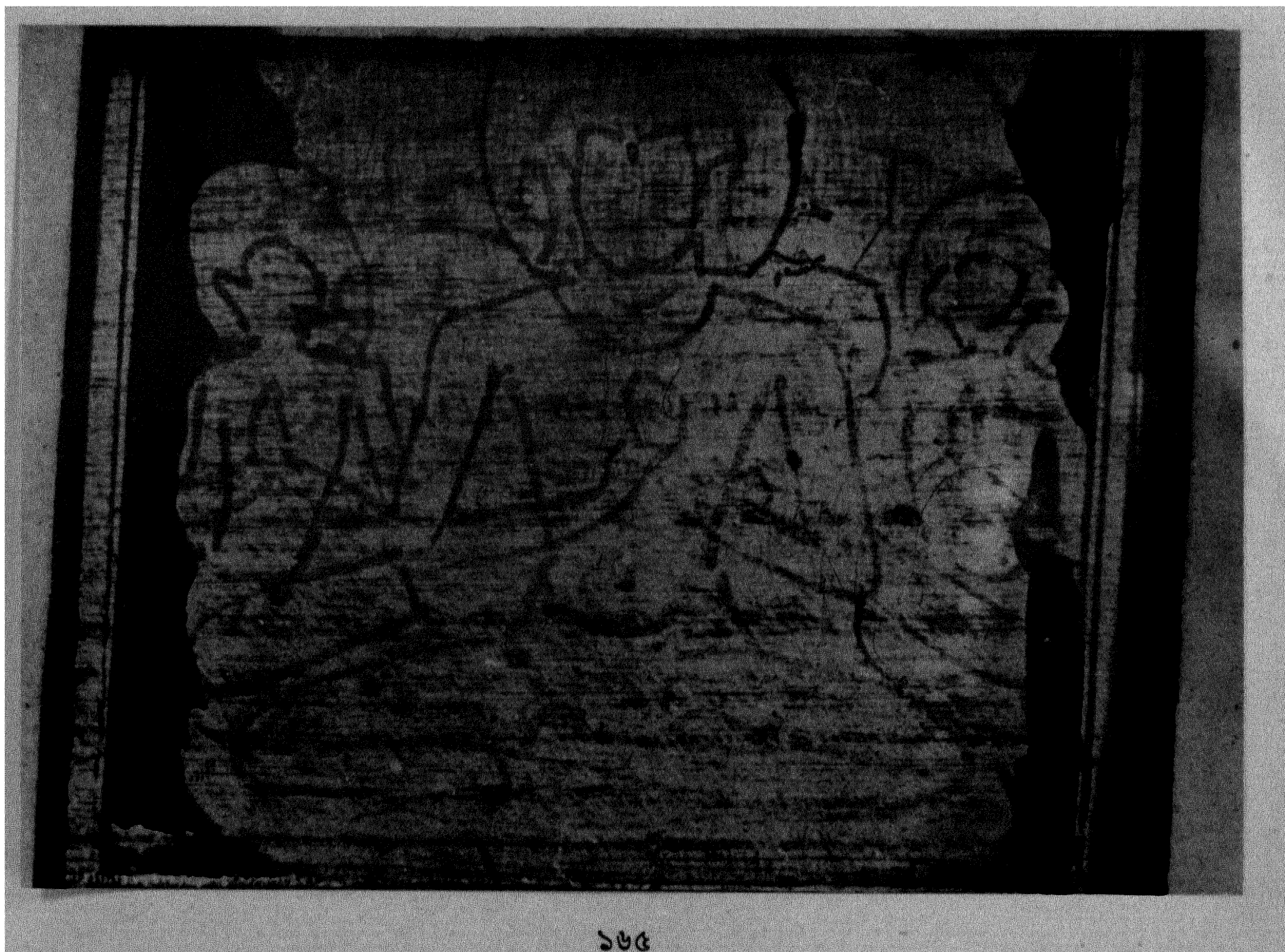


ভিন্ন আদর্শের মধ্যে দ্বিধা আর দ্বন্দ্বেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে মার্গরীতির আদর্শ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়েছে সত্য, তবুও এই আদর্শ হতে পাল চিত্রকলা একেবারে বিচ্যুত হয়নি। গোবিন্দপাল-নামাঙ্কিত ১১৭০-৭১ ও ১১৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথির (ক তালিকার ২২ ও ২৪ নং) দেব-দেবীর চিত্র আর গোমীন্দ্রপালের পুঁথির (ক তালিকার ২৫ নং) কয়েকখানি চিত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।। মধ্যযুগীয় রীত্যাদর্শের সচেতন প্রতিরোধ প্রয়াসই সমকালীন চিত্রকলার ইতিহাসে পাল চিত্রকলাকে দিয়েছে একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ।

পূর্ব-ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে পূর্ব-ভারতীয় বা পাল যুগের চিত্রকলার এই স্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটল। ভিন্নধর্মী বিদেশী প্রভুত্বের আমলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এই চিত্ররীতির সংহতি গুণের বিনষ্টি। মধ্যযুগীয় আদর্শের অবাধ অগ্রগতি আর রোধ করা সম্ভব হল না। পূর্ব-ভারতীয় বা পাল চিত্রকলা দ্রুত অগ্রসর হল অবক্ষয়ের পথে।

টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি তারিখ-বিহীন পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির চিত্রে (চিত্র নং ৩৩-৪০) এই অবক্ষয়ের সূচনা দেখা যায়। এ পুঁথির চিত্রে কৃতি-কুশলতার অভাব যেমন দেখা যায়, তেমনি আছে মৌল চারুতার অভাব। রেখা-বিন্যাস বা বর্ণ-বিন্যাসে আগের যুগের সযত্ন প্রয়াস আর লক্ষিত হয় না, ফলে চিত্রাঙ্কনে আছে স্থূলতার আভাস, যে আভাস পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলায় কালক্রমে স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে দেখা যায়।

এই অবক্ষয় পর্বের তিনখানা চিত্রিত পুঁথি আমাদের নজরে এসেছে। পাল রাজত্বের অবসানের পর এই তিনখানা পুঁথি প্রস্তুত হয়েছিল। বিষয়বস্তু ও রীতির বিচারে এই তিনখানি পুঁথির চিত্র পাল চিত্রকলার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত দেখা যায়। এই পর্যায়ের প্রথম পুঁথিখানি (ক তালিকার ২৬ নং) প্রস্তুত হয়েছিল ১২১১ শকাব্দে (১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবের রাজত্বকালে। এই মধুসেনদেব কে



ছিলেন তা আমাদের সঠিক জানা নেই। মুসলমানদের নদীয়া ও লক্ষণাবতী অধিকারের পরেও লক্ষণসেনের বংশধরেরা পূর্ব-বাংলায় কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন তা আমাদের জানা আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে মধুসেনদেব হয়তো লক্ষণসেনের বংশধর ছিলেন। পুঁথিখানির পুষ্পিকায় মধুসেনদেব 'পরমসৌগত' রূপে বর্ণিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী এই রাজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন-রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এ কথা বলা কঠিন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে মধুসেন-দেব পূর্ব বা দক্ষিণ-বঙ্গের কোন অঞ্চলে আপনার শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর পুঁথিখানি সেই অঞ্চলেই প্রস্তুত হয়েছিল।

পঞ্চরক্ষার এই পুঁথিখানির চিত্রে (চিত্র নং ৪১) দেখা যায়, পূর্ব আদর্শের পূর্ণ অবলুপ্তি। অঙ্কনসৌকর্য বা রঙের প্রসাদ-গুণের কিছু আর অবশিষ্ট নেই এই পুঁথির চিত্রে। রেখা-বিন্যাস কুটিল ও বহুধা-খণ্ডিত, ফলে গড়নের অবিচ্ছিন্নতাও ব্যাহত হয়েছে বিশেষভাবে। দেহভঙ্গীর কমনীয়তা ও সাবলীলতা গুণেরও একান্ত অভাব দেখা যায় একই কারণে। একমাত্রিক রঙের পাতলা আস্তরণ দেখা যায় এই চিত্র-গুলিতে। এই ধরণের বর্ণ-বিন্যাসে শ্যামোজ্জ্বলতা বা বর্তনার কোন আভাসই নেই। এক কথায় ত্রয়োদশ শতকের এই পুঁথির চিত্রে পূর্ব আদর্শের পুরো বিস্মৃতি লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তী শতকের পুঁথিচিত্রের তুলনায় পূর্ব-ভারতীয় বা পাল চিত্রকলার এই পরিণতি বেশ দ্রুত বলে মনে হলেও আকস্মিক নয়। এই চিত্ররীতির ধারার পর্যালোচনা আমরা করেছি। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পরিণতি ছিল কিছুটা প্রত্যাশিত। তবুও পূর্বভারতের স্বাতন্ত্র্যের শেষ যুগ পর্যন্ত এই চিত্ররীতি তার আদর্শের পরিপন্থী মধ্যযুগীয় ধারার অনুপ্রবেশ রোধ করতে চেষ্টা করেছে। স্বাতন্ত্র্য হারাবার সঙ্গে সঙ্গে প্লাবনের মত এই পরিপন্থী ধারা গ্রাস করেছে পূর্ব আদর্শকে।

চতুর্দশ শতকের পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্রের কোন নিদর্শন এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। এ শতকে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলা অবক্ষয়ের পথে আরও অগ্রসর



হয়েছে অনুমান করা অসংগত নয়। পঞ্চদশ শতকের দুখানি চিত্রিত পুঁথির সন্ধান আমরা পেয়েছি। একখানি কালচক্র তন্ত্রের পুঁথি—লেখা হয়েছিল ১৫০৩ বিক্রমাব্দে বা ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। পুঁথিখানি (ক তালিকার ২৭ নং) এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে (No. Add. 1364)। আর একখানি কারণ্ডব্যূহের পুঁথি (ক তালিকার ২৮ নং),—লিপির তারিখ ১৫১২ বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। এখানি এখন আছে বোম্বাই-এর হরিদাস সোয়ালি মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

প্রথম পুঁথিখানির পত্রে কোন চিত্র নেই—চিত্রাঙ্কন দেখা যায় পুঁথির পাটা দুখানির উভয় দিকে, আর এই পাটার চিত্র পুঁথি লেখার কালের সমসাময়িক মনে করাই যুক্তিযুক্ত। এই চিত্রে রঙের কোন ব্যঞ্জনা দেখা যায় না; রেখা হ্রস্ব আর খণ্ডিত, ফলে দেহের গড়ন আর ভংগী বিশেষভাবে ব্যাহত আর বিচ্ছিন্ন। দেহসীমার বাইরে উদ্গত নেত্রও প্রকটভাবে বিদ্যমান। পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলার সমস্ত গুণ-বৈভবের পুরো অবসান লক্ষ করা যায় এই পাটার চিত্রে। ১৫১২ বিক্রমাব্দের কারণ্ডব্যূহের পুঁথিতে চিত্র দেখা যায় পত্রে আর পাটায়। এই চিত্রও একই লক্ষণাক্রান্ত। রঙের ব্যবহার এ পুঁথির চিত্রে খুবই কম; রঙের বিন্যাসও অতিমাত্রায় ব্যঞ্জনাহীন। উদ্গত নেত্রও এ সব চিত্রে সমভাবে প্রকট। এ পুঁথির চিত্রে রেখা-বিন্যাস কুটিল, কিন্তু তুলনায় ছেদহীন আর কতকটা সাবলীলও বটে। হয়তো পুরোনো ধারার রেখার প্রসাদ-গুণ আবার আয়ত্ত করবার নতুন প্রচেষ্টার ইংগিত পাওয়া যায় এ সব চিত্রে। ১৪০১ শকাব্দ বা ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হরিবংশের একখানি পুঁথির পাটার চিত্রেও এই লক্ষণ বিদ্যমান। বাংলায় লেখা এই পুঁথিখানি পাটাসহ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে এখন রক্ষিত আছে। প্রায় দুশো বছর পরের একখানি পুঁথির চিত্রে এই নতুন ধারার প্রকাশ আরও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। পুঁথিখানি ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের, বাংলায় লেখা, প্রস্তুত হয়েছিল ১৬১১ শকাব্দে, বা ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। পুঁথিখানিতে অনেক চিত্র দেখা যায়। একখানি চিত্রিত পাটাও তার বর্তমান। পুঁথির চিত্রে রঙের ব্যবহার খুবই সীমিত, তার বিন্যাসেও আছে ব্যঞ্জনার অভাব। রেখার



বিন্যাস কিন্তু অনেক সাবলীল; তার টানে বর্তনা-সৃষ্টির প্রয়াসও বেশ স্পষ্ট। পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলা নতুনের পথে যাত্রা শুরু করেছে, আর এই যাত্রা যে পুরোনো কৃতির স্মরণে তার ইঙ্গিত আমরা পাই এই তিনখানি পুঁথির চিত্রে।

। ৬ ।

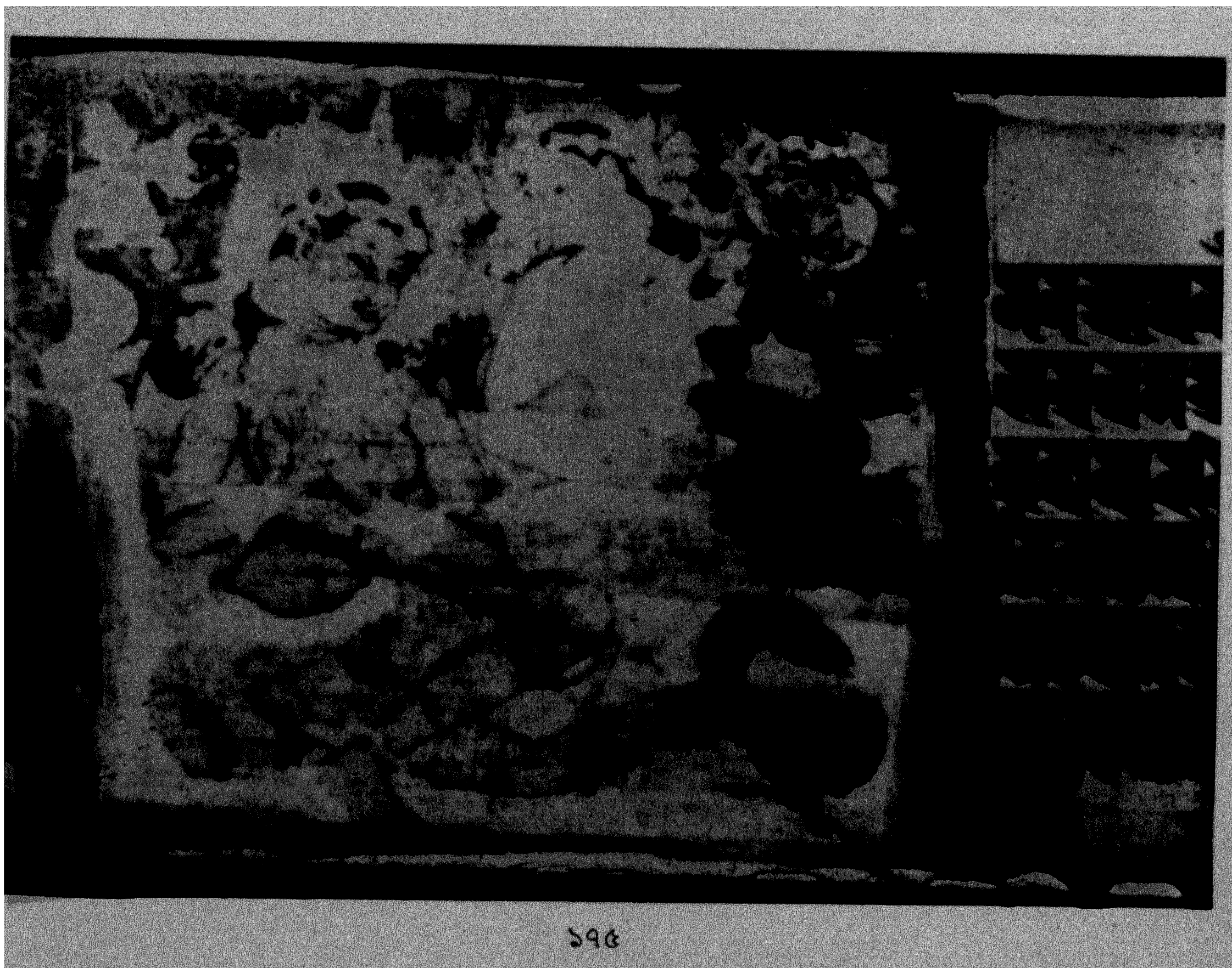
পূর্বমধ্যযুগে ধর্মগ্রন্থের পুঁথির পাতায় আর পাটায় চিত্র রচনার রেওয়াজ দেখা যায়। প্রায় সমসময়ে পুঁথির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র আশ্রয় করে দুটি চিত্র-রীতি গড়ে উঠেছিল—একটি পূর্ব-ভারতে আর একটি পশ্চিম-ভারতে। পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি-চিত্রের নিদর্শন এখন বিদ্যমান আছে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ পাদ থেকে—তার-নাথের বিবরণ মতে এ রীতির উদ্ভব হয়েছিল নবম শতকের শুরুতে। এই রীতি গড়ে উঠেছিল মুখ্যতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের আওতায়। পূর্ব-ভারতে মুসলমান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি দ্রুত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়। পশ্চিম-ভারতীয় রীতিটির উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ জৈন ধর্মাবলম্বীদের আনুকূল্যে। এ-রীতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন যা এখন অবশিষ্ট আছে তার তারিখ ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এ দুটি রীতি দুটি পৃথক শিল্প-মানসের পরিচয় দেয়। এ সব বিষয়ের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। পশ্চিম-ভারতীয় রীতিটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। সুলতানী শাসনের যুগেও এ রীতি তার আপন সত্তা বা পূর্ব ঐতিহ্য হারায়নি। বরং নূতন ধারার সংযোজনে প্রাণবন্ত হয়ে ভারতীয় চিত্রকলার পরবর্তী ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছে বিশেষ ভাবে। ভারতীয় চিত্রকলার সামগ্রিক ইতিহাসে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্ররীতির বিশিষ্ট অবদান আছে।

উন্মেষ ও বিকাশের যুগে পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির প্রভাব অনেক দূর ব্যাপ্ত হয়েছিল উত্তরে আর পূবে। নেপালী চিত্রকর্মে পূর্ব-ভারতীয় রীতি অনুসৃত হয়ে-

ছিল তারনাথের এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। নেপাল থেকে এই চিত্ররীতি প্রসারিত হয়েছিল তিব্বতে তার প্রমাণও স্পষ্ট। ব্রহ্ম দেশেও পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির প্রভাব অনুভূত হয়েছিল তার সাক্ষ্য বর্তমান আছে পাগান মন্দিরসমূহের চিত্রাবলীতে। তখনকার বৌদ্ধ জগতে পূর্ব-ভারতীয় এই চিত্ররীতির প্রসার হয়েছিল সর্বাধিক।

পূর্ব-ভারতীয় ও নেপালী তারিখ-যুক্ত চিত্রিত পুঁথির তালিকা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (ক ও গ তালিকা)। তালিকা দুটি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, একে অপরটির পরিপূরক। তালিকা-দৃষ্টে এই দুই অঞ্চলের চিত্রকৃতির তুলনা-মূলক আলোচনা সম্ভব, আর তার প্রয়োজনও আছে সংগত কারণেই। পূর্ব-ভারতীয় চিত্র-রীতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন যা এখন বিদ্যমান আছে, সেটি প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা মহাবিহারে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি চিত্রিত পুঁথি (ক তালিকার ১ নং)। পুঁথিখানির তারিখ অনুমান করা যায় ৯৮০ থেকে ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রথম মহীপালদেব অন্তত আটচল্লিশ বছর রাজত্ব করে-ছিলেন আমাদের জানা আছে। তাঁর সময়ের আরও দু'খানি চিত্রিত পুঁথি (ক তালিকার ২ ও ৩ নং) বর্তমান। মহীপালদেবের সমসাময়িক পূর্ব-বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্রদেবের রাজ্যাঙ্কের পঞ্চরক্ষার পুঁথিখানি (ক তালিকার ৪ নং) মহীপাল-দেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যেই পূর্ব-বঙ্গে প্রস্তুত হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। নেপালী চিত্রিত পুঁথির অধুনা-বর্তমান সর্বপ্রথম নিদর্শনের (গ তালিকার ১ নং) তারিখ ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ; দ্বিতীয়খানি (গ তালিকার ২ নং) প্রস্তুত হয়েছিল ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দে। নেপালের এই দু'খানি চিত্রিত পুঁথি প্রথম মহীপালদেবের পূর্ব-ভারতে রাজত্বকালের মধ্যেই তৈরী হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। প্রথম মহীপালদেবের পর রামপালদেবের রাজত্বের অন্ত পর্যন্ত আমাদের পূর্ব-ভারতীয় তালিকায় আছে বারখানি চিত্রিত পুঁথি (ক তালিকার ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং)। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে দ্বাদশ





('mere shadow')। নেপালী ও পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্র পাশাপাশি পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সমর্থন করতে বেশ দ্বিধা জাগে। মিলের সঙ্গে অমিলও কিছু ধরা পড়ে এই ধরনের পরীক্ষায়। নেপালী চিত্রকর্ম পূর্ব-ভারতের নিকট বিশেষভাবে ঋণী সন্দেহ নাই; তবে পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির কৃতিসৌকর্য আর বর্তনাময় গুণবৈশিষ্ট্য নেপালী চিত্রকরেরা সবসময় যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি এ কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

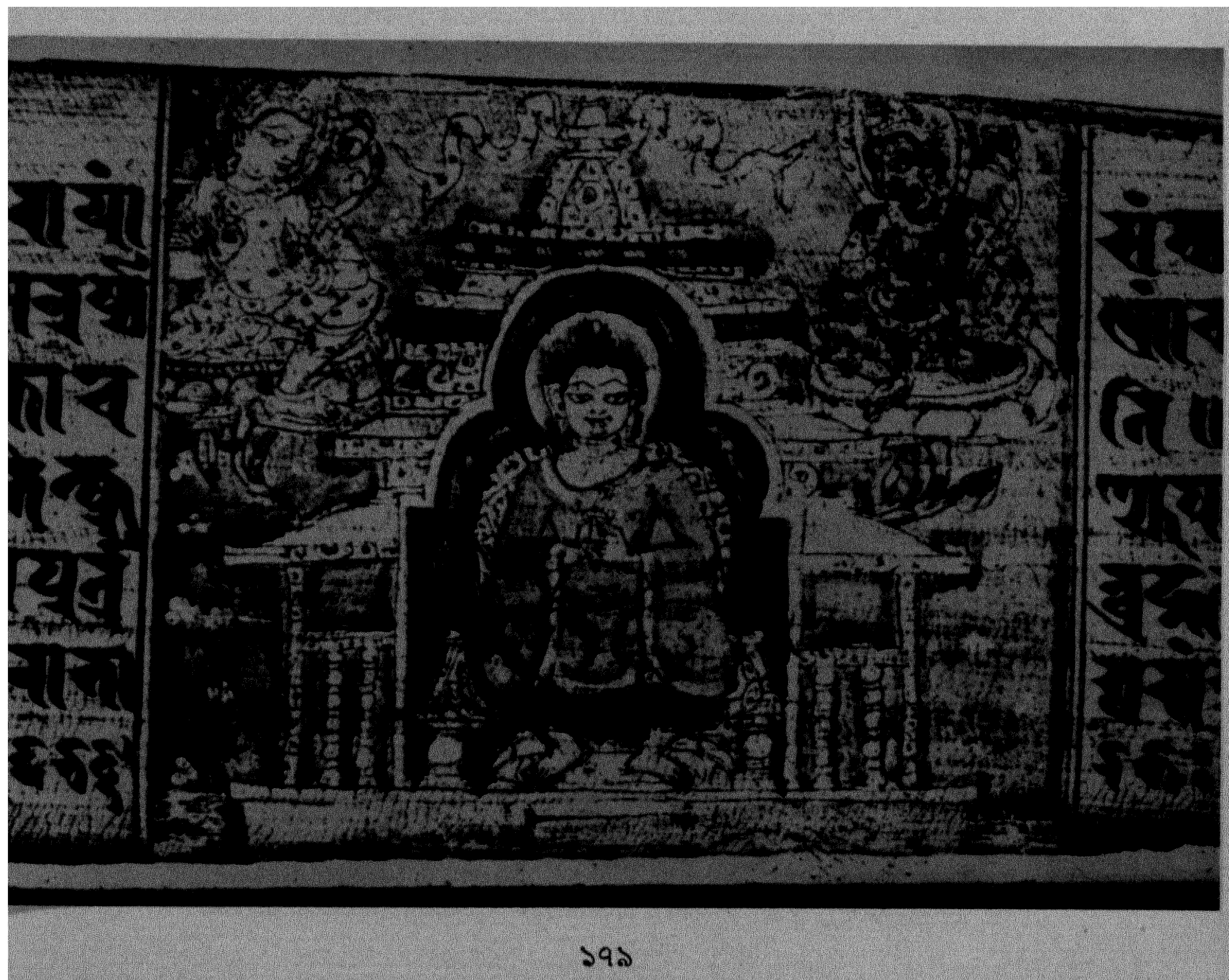
পূর্ব-ভারতীয় বা পালযুগের চিত্রকলার বিস্তৃত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে এই চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল গুপ্তযুগের মার্গ চিত্ররীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর। এই রীতি ছিল বর্তনার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর—আর এই বর্তনা ব্যক্ত হয়েছে যেমন সুললিত, সাবলীল আর তরঙ্গায়িত রেখার টানে, তেমনি রঙের বিভিন্ন ছায়ের সুসম ব্যবহারে। দেহের নতোন্নত অংশ আর তার বর্তুলতা ফুটে উঠেছে রেখা আর রঙের এই সম্মিলিত গুণবৈভবে। প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের (ক তালিকার ১ নং) পুঁথির চিত্রে এই গুণসমাবেশ দেখা যায় প্রকৃষ্টভাবে—তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। প্রথম মহীপালদেবের আর দুখানি পুঁথির (ক তালিকার ২ ও ৩ নং) চিত্রেও এই বর্তনা-গুণ বিদ্যমান। পরবর্তী কালে রঙের আস্তরণ কিছুটা পাতলা হওয়ার দরুন রঙের বর্তনা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে সত্য, তবুও দ্বাদশ শতকের অন্ত অবধি রেখা-বর্তনা আর রঙের বর্তনা দুইই দেখা যায় পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকখানি পুঁথির চিত্রের উল্লেখ করতে পারি এ প্রসঙ্গে—নয়পালদেবের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের পুঁথি (ক তালিকার ৫ নং), রামপালদেবের নবম, পঞ্চদশ ও ষট্‌ত্রিংশত্তম রাজ্যাঙ্কের পুঁথি (ক তালিকার ৯, ১০ ও ১২ নং), মদনপালদেবের ১৭ রাজসম্বতের পুঁথি (ক তালিকার ১৯ নং), গোবিন্দপালদেবের ৯, ১৮, ২২ ও ৩২ সংবতের পুঁথি (ক তালিকার ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং), আর গোমীন্দ্রপালদেবের চতুর্থ সম্বৎসরের পুঁথি (ক তালিকার ২৫ নং)। এই বৈশিষ্ট্যই সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলাকে দিয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা। এই চিত্রকলা



ছিল গুপ্তকালীন বর্তনা-ব্যঞ্জনাময় মার্গরীতির ধারক ও বাহক।

নেপালী চিত্রকরেরা পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির অনুসরণ করলেও তার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। নেপালী চিত্রকর্মে রঙের বর্তনা নেই বললেই চলে—হয়তো এই বর্তনার রহস্য ঠিকমত অনুধাবন করতে পরেনি অধিকাংশ নেপালী চিত্রকর। আবার নেপালী চিত্রকর্মে রেখা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হ্রস্ব, কুটিল আর বিচ্ছিন্ন—পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্রের রেখার মত সাবলীল, সুললিত ও ছন্দোময় নয়। ফলে নেপালী চিত্রকর্মে রেখা-বর্তনার আভাস দেখা যায় ক্বচিৎ।

প্রথম মহীপালদেবের আমলে পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির চিত্রে বর্তনা-ব্যঞ্জনার যে প্রকাশ দেখা যায় সমসাময়িক নেপালী পুঁথির চিত্রে তা লক্ষ করা যায় না। ১০১৫ ও ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দের দুখানি নেপালী পুঁথির (গ তালিকার ১ ও ২ নং) চিত্র মহীপালদেবের সমসাময়িক বলেই আমরা মনে করি। প্রথমখানিতে (চিত্র নং ৪৩, ৫৫) রঙের বর্তনার আভাসমাত্র নাই, আবার রেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রস্ব আর ভঙ্গুর—ফলে রেখা-বর্তনার অভাবও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দের পাটার চিত্রে রেখা অনেকটা সাবলীল, তবে রঙ পাতলা আর প্রায় ছায়-রহিত। অধিকাংশ নেপালী পুঁথির চিত্রেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, আর এই বৈশিষ্ট্য পূর্ব-ভারতীয় রীতির রেখা ও রঙের বিন্যাসের বিপরীত। দুখানি নেপালী পুঁথির (গ তালিকার ৬ ও ৭ নং) চিত্র পূর্ব-ভারতীয় রীতির বর্তনা-বোধের কিছুটা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বলে মনে হয়। এ দুখানি পুঁথির চিত্রে (চিত্র নং ৪৪, ৪৫) সাবলীল ও সুললিত রেখা আর ছায়-যুক্ত রঙের ব্যবহারে বর্তনা-সৃষ্টির যে আভাস দেখা যায়, বলা বাহুল্য তা পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতির অনুসরণে। তারিখের দিক থেকে পুঁথি দুখানি রামপাল-দেবের সময়ের কাছাকাছি। কিন্তু সে-সময়ের পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির চিত্রে রেখা আর রঙে বর্তনা-বোধের যে সুষ্ঠু প্রকাশ, এই নেপালী পুঁথি দুখানির চিত্র সে স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। মনে রাখা প্রয়োজন, এই দুখানি পুঁথি নেপালী চিত্রিত পুঁথি-



সম্ভারে ব্যতিক্রম বলে মনে করতে হবে। এক কথায় বলা যায় কৃতিসৌকর্যের যে মান আমরা পূর্ব-ভারতীয় পুঁথিচিত্রে লক্ষ করি নেপালী পুঁথিচিত্র সে মান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। রেখার ছন্দে আর রঙের ছায়ে বর্তনা-বোধের যে প্রকাশ পূর্ব-ভারতীয় চিত্র-রীতিতে লক্ষিত হয় সমষ্টিগতভাবে তা নেপালী পুঁথিচিত্রে দেখা যায় না। নীচের উদ্ধৃতিটি এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"Nepal borrowed the form and manner of the Eastern School with certain reservations, it seems. In this residual Nepalese idiom the Eastern school survives for a few centuries more after its disappearance from its own country."*

---

*S. K. Saraswati, 'East Indian Manuscript Painting', *Chhavi*, p. 260.

পরিশিষ্ট

পাল যুগের চিত্রকলা সম্পর্কে এই পুস্তিকাখানি রচিত হয়েছে সে যুগের পুঁথিচিত্রের অবলম্বনে। এই পুঁথিচিত্রের বেশ কিছুসংখ্যক নিদর্শনের সন্ধান আমরা পেয়েছি, আর সে-সব নিদর্শনও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীতে। স্বভাবতঃই ধারণা হতে পারে যে পাল যুগের চিত্ররীতি বা পূর্ব-ভারতীয় চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল এই পুঁথিচিত্র আশ্রয় করে। পাটনার এক খবরে জানা যায় নালন্দার সাম্প্রতিক খনন-কার্যে নাকি কিছু দেয়ালচিত্রের অবশেষ পাওয়া গেছে। ধর্মীয় সৌধে চিত্রাঙ্কনের রীতি বেশ প্রাচীন। এই দৃষ্টিতে নালন্দা মহাবিহারে দেয়ালচিত্রের অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখা যায়। অবশ্য নালন্দার এই দেয়ালচিত্র সম্বন্ধে কোন সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবুও হয়তো অনুমান করা যেতে পারে যে পাল যুগে দেয়ালচিত্র বা ভিত্তিচিত্র একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। তবে এ চিত্ররীতি অনুশীলনের ব্যাপারে পুঁথিচিত্রই আমাদের মূল উপাদান, আর এই উপাদানের মাধ্যমে এই চিত্ররীতির যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি সে বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছিল সে যুগের দেয়ালচিত্রে।

নির্দেশিকা